দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের সংবিধান
ভারতীয় গণতন্ত্রের
ধর্মগ্রন্থ — পৃঃ ৩৫

সাধারণতন্ত্র দিবসের
প্যারেডে স্বয়ংসেবকদের
অংশগ্রহণ— পৃঃ ২৩

৭৭ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ২৭ জানুয়ারি, ২০২৫।। ১৩ মাঘ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭৭ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ১৩ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৭ জানুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কি আদৌ কাটবে : কার পাপে?
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদির হাতে রক্ত? সাহস তো কম নয়! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

নব্বইয়ের দশক সম্ভূতসম্পন্ন ক্রেতা এবং সাহসী উদ্যোগপতিসমূহ ☐ দুব্বুরি সুব্বারাও ☐ ৮

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগামীদিনে ভারতকে সামরিক-শক্তির পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরেও লড়তে হবে
☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

চীনা এজেন্ট বামেদের লিগ্যাসি বহন করে চলা মমতা কি জিহাদি শক্তির এজেন্ট হয়ে উঠেছেন
☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১১

বাংলাদেশের রক্ত দিয়ে কেনা স্বাধীনতা আজ কলঙ্কিত
☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৩

ডাঃ হেডগেওয়ার এবং ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর
☐ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ১৫

রাজতন্ত্রে প্রজাতন্ত্র : ইতিহাসের পালাবদল অথবা কাঁঠালের আমসত্ত্ব ☐ সুজিত রায় ☐ ১৭

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে স্বয়ংসেবকদের অংশগ্রহণ
☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ২৩

কংগ্রেসি শাসনকালে আক্রান্ত ও রক্তাক্ত ভারতের সংবিধান
☐ দেবজিৎ সরকার ☐ ২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার আশীর্বাদধন্যা নগেন্দ্রবালা দেবী
☐ দীপক খাঁ ☐ ৩১

ভারতের সংবিধান ভারতীয় গণতন্ত্রের ধর্মগ্রন্থ
☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৩৫

ন্যক্কারজনক ঘটনা : বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে স্টল প্রদানে বাধা ☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ৪১

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শুরুর পটভূমিকা
☐ অভিমন্যু রায় ☐ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০** ☐ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭, ৪৯**

প্রকাশিত হবে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দেবী সরস্বতী

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা নিবেদন। পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেবদেবীর কাছে মাথা নত করা এবং তাঁদের উপাসনা ও সাধনা। দেবদেবীরা ঈশ্বরীয় গুণ বা শক্তির প্রকাশ। মা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানই সরস্বতী পূজা। দেবী সরস্বতীর মাহাত্ম্য, সরস্বতী নদী বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় লিখবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০/- + ৩৬০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০/- + ৮৫০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প

সাধারণতন্ত্র দিবসটি ভারতবাসীর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতঅর্থে এই দিনটিই স্বাধীনতা দিবস। পনেরো আগস্ট প্রাপ্ত স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব হইতেই দিনটি স্বাধীনতা দিবসরূপে পালিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের এই দিনেই তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে সমগ্র দেশে স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করা হইয়াছে। রাজনীতি বিজ্ঞানের গবেষকগণের মতে, ১৯৪৭ সালের পনেরো আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর হইয়াছে মাত্র। তাহাও দেশমাতৃকাকে খণ্ডিত করিয়া এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে। পনেরো আগস্ট জাতি স্বাধীনতা পাইলেও স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পায় নাই। তাহা নামে মাত্র স্বাধীনতা ছিল। ১৯৫০ সাল অবধি দেশের প্রধান রূপে ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং গভর্নর জেনারেল রূপে মাউন্টব্যাটেনই ছিলেন। ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক তদবধি ভারতের আকাশে সগৌরবে উড্ডীন ছিল। তদবধি ঔপনিবেশিক ভারতশাসন আইনের মাধ্যমেই দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হইত। ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে ইহার প্রায় আড়াই বৎসর পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। কারণ এইদিন ভারতবাসীর শাসনতন্ত্র অর্থাৎ সংবিধান কার্যকর হইয়াছে এবং ইহার সঙ্গেই দেশ হইতে ব্রিটিশ আধিপত্য চিরতরে অপসারিত হইয়াছে। দেশবাসীর সম্মুখে এই সত্য কথাটি কোনোদিন প্রকাশ করেন নাই তৎকালীন নেতৃবৃন্দ । আশ্চর্যের বিষয় হইল, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক এই বেদনাদায়ক সত্যটি বিদ্যার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন নাই। ইহার দোষ অবশ্য শিক্ষক, অধ্যাপকদিগের নহে, পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়ে কোনোরূপ আলোকপাত করাই হয় নাই। তাই স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান প্রজন্ম সাধারণতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব অনুভব করিতেই পারে নাই। পনেরো আগস্ট বেদনার মধ্য দিয়া স্বাধীনতা আসিয়াছিল। এই দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যাঁহারা প্রাণ বলিদান দিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। দিল্লির লালকেল্লা হইতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়া থাকেন প্রধানমন্ত্রী। সাধারণতন্ত্র দিবসে জাতির স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবার কারণে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সম্মুখে জাতির স্বাভিমান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী দেশের সংবিধান অনুসারে দেশের বিকাশ সাধন তথা অগ্রগতির শপথ লইয়া থাকেন। বর্তমান প্রজন্মের সম্ভবত অজানা যে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের নামে শপথ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সংবিধান কার্যকরী হইবার পর হইতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদিগকে ঈশ্বর ও সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করিবার রীতি চালু হইয়াছে। সংবিধানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সংবিধানকে ভারতীয় গণতন্ত্রের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সংবিধান প্রণেতাগণও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন রূপেই জাতির সম্মুখে সংবিধানকে উপস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর বহু পরিশ্রম করিয়া জাতির স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই সংবিধান প্রণয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে, সংবিধান কার্যকরী হইবার অব্যবহিত পরেই ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংবিধানের ব্যবচ্ছেদ করিতে শুরু করিয়াছে। জাতির স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতির বিকাশের জন্য যে সংবিধান তাহাকে জাতি বিঘটনের কার্যে ব্যবহার করিয়াছে। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করিবার কার্যে ব্যবহার করিয়াছে। জাতির সৌভাগ্য যে, বিগত এক দশক যাবৎ রাষ্ট্রবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পূর্বতন সরকারের অপকর্মগুলিকে বিদূরিত করিয়া দেশ তথা দেশবাসীর বিকাশের কার্যে তৎপর রহিয়াছেন। পূর্বতন সরকার শুধুমাত্র দলীয় অথবা পারিবারিক স্বার্থে বহুবার সংবিধানের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছে। এমনকী তাহারা সংবিধানের অন্তরাত্মা 'প্রস্তাবনা'ও সংশোধন করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় হইল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যখন সংবিধান নির্দেশিত পথে দেশের বিকাশ সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে, তখন প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি তাহার বিরোধিতায় সরব হইতেছে। ইহার অবশ্য কারণও রহিয়াছে, তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক অদ্যাবধি ঔপনিবেশিক শাসনেই আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান ভারত স্বতন্ত্র ভারত, স্বাভিমানী ভারত, সমর্থ ভারত। বৈদেশিক মানসিকতার সমস্ত রকম গ্লানি অপসারণ করিয়া বর্তমান ভারত তাহার বিকাশ সাধনে বদ্ধপরিকর।

সুভাষিতম্

স্বাতন্ত্র্যাৎ সুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যাল্লভতে পরম্।
স্বাতন্ত্র্যাৎ নির্বৃত্তিং গচ্ছেৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমং পদম্।।

মানুষ স্বাধীনতার কারণে সুখ প্রাপ্ত করে, স্বাধীনতার কারণে পরম তত্ত্ব লাভ করে, স্বাধীনতার কারণে শান্তি লাভ করে এবং স্বাধীনতার কারণে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কি আদৌ কাটবে কার পাপে?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিশেষ একটি অসুখ সারাতে কোন ওষুধ ব্যবহার করা উচিত তার বিজ্ঞাপন তুলে ধরে পাঁচের দশকে একটি সিনেমা তৈরি হয়। সিনেমাটির সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিস্তর মিল। তাকে অস্বাস্থ্যকর বলাটাই সঠিক। বিচারে অভয়া মামলার এক দোষীর যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ফাঁসি চেয়েছিলেন। ১৯৯০ সালে হেতল পারেখ মামলায় মমতা ব্যানার্জি ফাঁসির বিরোধিতা করেছিলেন। ১৪ বছর পর আসামির ফাঁসি হয়। তাঁর এখনকার ভাবটা পাপ ঘাড় থেকে নামলে বাঁচি। হাস্যকর যে মমতাই প্রকাশ্যে ব্যলছিলেন, 'এতে আমার কোনো লেনা-দেনা নেই'। তাহলে ফাঁসি চাওয়ার বাড়তি আগ্রহ কেন? আসলে ঠিক বেঠিক যা হোক ২০২৬-এর ভোটের আগে মমতা বলতে চান 'আমি না থাকলে দোষীর চরম সাজা হতো না'। নকল পুলিশকে (সিভিক) আসল পুলিশ ধরে সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করেছিল।

মমতা ব্যানার্জির চটুল যুক্তি জাল বুনতে পারদর্শী। ফাঁসি চাওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ রাজ্য পুলিশ আর কাউকে দোষী সাজাতে খুঁজে পায়নি। সেই না পাওয়াটাও স্বাভাবিক। তারাই অভয়াকাণ্ডের প্রমাণ লোপাটের অন্যতম কারিগর বলে অভিযোগ। সে মামলা চলছে। সেই দোষীদের সমান সাজা হওয়া উচিত, মমতা এমন দাবি কোনোদিন করেননি। ন্যায় সংহিতায় তেমনটাই সুপারিশ করা রয়েছে। প্রথম দোষীর সাজা সিবিআইয়ের অনুসন্ধানভিত্তিক। রাজ্য পুলিশের হাত থেকে তদন্ত কেড়ে সিবিআইয়ের বক্তব্য তুলে ধরা নয় আর মিথ্যা দাবি করা যে আমরাই করে দেখালাম। কোনো সরকারই সমান্তরাল তদন্ত চায় না। ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর সব চাইতে বেশি নজর দিয়েছিলেন। অভয়া আর স্যালাইন কাণ্ডের পর সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে উঠেছেন তিনি নিজেই।

মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুরাহার শপথ নিয়ে পথে নেমে এখন তার গঙ্গাযাত্রা করিয়ে ছেড়েছেন। বিরোধী থাকার সময় বাম স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেশিরভাগ অনিয়ম আটকাতে তিনি ব্যর্থ হন। সেই সময় বানতলার নারকীয় ঘটনায় মমতা ব্যানার্জি যতটা এগিয়েছিলেন অভয়ার ঘটনায় শাসক হিসেবে ঠিক ততটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন। আশির দশকে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উপর জ্যোতি বসুর পুলিশের লাঠি পড়লে মমতা ব্যানার্জি নামকাওয়াস্তে তাদের পাশে দাঁড়ান। গভীর বা দীর্ঘ আন্দোলন করতে তিনি অভ্যস্ত নন। তাতে সময় ব্যয় হয়। সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামে যে আন্দোলনের ধ্বজা ওড়ানো হয় তার সময় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে তিনি একসঙ্গে বহু আন্দোলন কেন করতেন। অভয়াকাণ্ডে এখন পর্যন্ত একজন মাত্র দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আন্দোলন আবার গতি পাবে। এখন মমতা ব্যানার্জি হয়তো এটা বলতে পারবেন যে আসল দোষী যখন ধরা পড়েই গিয়েছে তাই সিপিএমের লাইন সঙ্গত ছিল। জ্যোতি বসুর রাস্তায় ফিরে যাবেন।

> **স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই অর্থের সরবরাহ যদি চালু রাখতে হয় তা লজ্জার আর ঘৃণার। নিজের তৈরি অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাঁকে মমতা আটকে গিয়েছেন।**

পারিবারিক আর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য সুরাহার পথে নামিয়েছিল। ক্ষমতা যে পথভ্রষ্ট করতে পারে তার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ তিনি নিজে। চুরি আর দুর্নীতির সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যে অসুখ গত চোদ্দ বছরে প্রবেশ করেছে তা সহজে সেরে যাওয়ার নয়। তিনি আঞ্চলিক দল চালান তাই প্রতি মুহূর্তে অর্থের প্রয়োজন পড়ে। তাঁর বহু রসদ্দার রয়েছেন।

তবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই অর্থের সরবরাহ যদি চালু রাখতে হয় তা লজ্জার আর ঘৃণার। নিজের তৈরি অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাঁকে মমতা আটকে গিয়েছেন। তাতে রাজ্যের মানুষের যেমন ক্ষতি সমানভাবেই লজ্জার যে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। বাম জমানায় মাদ্রাজগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেসের নাম হয়েছিল মেডিক্যাল এক্সপ্রেস। কার পাপে তা আরও খর্বাকৃতি হলো? স্বাস্থ্য সাথীর সেই সাথী যদি অভয়া বা স্যালাইন কাণ্ড হয় তাহলে রাজ্যের মানুষের তাকে বয়কট করা উচিত।

দিদির হাতে রক্ত? সাহস তো কম নয়!

রক্তহস্তেষু দিদি,

মাতৃঘাতী সরকার, আর নেই দরকার। সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পরেই এক মায়ের মৃত্যুর পরে এই স্লোগান তুলেছে বিজেপি। এটা ঠিক যে, সেই মায়ের জন্য শোকপ্রকাশ দরকার। কিন্তু আমি আজ শোকপ্রকাশ করতে চাই এক মাতৃহারা নবজাতকের জন্য। শুধু স্বাস্থ্য দফতরের অন্যায়ের জন্য যে শিশু জন্মের পরেই মাকে হারিয়েছে। চোখ ফোটার আগেই তাঁর মায়ের শরীরে বিষ স্যালাইন ঢুকিয়ে খুন করা হয়েছে। তা বলে বিজেপির ওই অন্যায় স্লোগান আমি নিতে পারব না দিদি।

ওঁরা বলছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি খুনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও আপনি খুনি। রাজ্যে রোজ রোজ খুন হয়। তা বলে সবের দায়িত্ব আপনি নেবেন নাকি! আর তাই বলে কি এবার আপনি মাতৃঘাতী হলেন! মোটেও না। বিষ স্যালাইনের বিষয়টা তো আপনি জানতেনই না। যে ভাইয়েরা স্যালাইন নিয়ে করেকম্মে খায়, তারা বলতে পারবে।

তবে এক নবজাতকের সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে মামণি রুইদাসের মৃত্যু প্রশাসনের অপকর্ম প্রকাশ করেছে। স্যালাইন অথবা অক্সিটোসিন ইনজেকশনে দূষণের জন্য প্রসূতির মৃত্যু হচ্ছে, এমন সন্দেহ কিন্তু এই রাজ্যে প্রথম নয়। গত কয়েক বছরে নানা মেডিক্যাল কলেজে দেখা গিয়েছে, অস্ত্রোপচার করে প্রসবের পরে একাধিক প্রসূতির অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে, কয়েকটি মৃত্যুও ঘটেছে। এপ্রিল থেকে জুন ২০২৪, এই তিন মাসে এ রাজ্যে প্রসূতিমৃত্যুর অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছিল এক লপ্তে ১০৩। গোটা দেশের গড় যেখানে ৯৭ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে ১০৩। লজ্জা লাগে। এসব আমি নই, সবাই বলছে। গোটা দেশের সামনে বাঙ্গালি হিসেবে নাকি মুখ দেখাতে লজ্জা করছে তাদের। দেখাস না মুখ। কে দিব্যি দিয়েছে!

আপনি বরং গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকুন। মন্ত্রীদের দিয়ে জলসা করান। আর মন্ত্রীরাও যেন সভাসদ। আগে জমিদারদের যেমন সখ ছিল তেমন। সভাসদরা রুবি রায় শোনান। রুবি রায় কার তা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আর পর্যটন মন্ত্রীর লড়াইও হোক। সবাই হো হো করে হাসুক আর চোখ বড়ো বড়ো করে দেখুক।

আর একজন মন্ত্রী আছেন, তিনি আবার কলকাতার মেয়রও। তিনি রাজ্যের উন্নতি, কলকাতার উন্নতি নিয়ে কতটা ভাবেন কেউ জানে না। তিনি শুধু ভাবেন কীভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা যাবে। তিনি বিচারব্যবস্থাও দখল করতে চান। তিনি ইসলামের তালিম পদ্ধতির বিকাশ চান। যেটা তাঁর আদৌ কাজই নয়। সেই ফিরহাদ আপনার প্রিয়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে অকথা, কুকথা চলছে দিদি। শুনছি তাই আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

দিদি, তথ্য বলছে, ২০১৫-১৭ সালে যখন প্রসূতি মৃত্যুর জাতীয় হার ছিল এক লক্ষে ১১২, তখন এরাজ্যে ছিল ৯৪। দেশ এগিয়েছে, রাজ্য পিছিয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে ১১৬২ জন প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে। কেন্দ্রের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ রিপোর্ট জমা পড়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সেগুলি থেকে সরকার শিক্ষা নেয়নি, তার প্রমাণ মামণি রুইদাস নামে মায়ের মৃত্যু। আরও কয়েকজন মা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন। তাঁদের সুস্থ্য জীবন কামনা করি। এক মা সন্তানকেও হারিয়েছেন। তাঁকে কী সান্তনা দেব জানি না। আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না দিদি। জানি আপনার মনও কাঁদছে। কিন্তু কী আর করবেন। দল তো চালাতে হবে! তাতে টাকা দরকার। আর তার জন্য মদ থেকে স্যালাইন সবেই কমিশন দরকার। আমি বুঝি দিদি, আমি বুঝি।

কিন্তু দিদি, বার বার এটা হচ্ছে। প্রতিটি ঘটনার পরেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তদন্ত হয়েছে, ওষুধের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকারের জন্য কী করা হয়েছে, জানা যায়নি। ফলে ফের এক প্রসূতির মৃত্যু হলো, আরও চার জনের প্রাণসঙ্কট ঘটল। সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে কালো তালিকাভুক্ত সংস্থার স্যালাইনের ব্যবহার। অক্সিটোসিন সুরক্ষিত রাখতে 'কোল্ড চেন' যথাযথ সংরক্ষিত হয়েছে কিনা, সে প্রশ্নও উঠেছে। যে কোনোও গণতান্ত্রিক দেশে এমন ঘটনা ঘটলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার শীর্ষ কর্তারাও তদন্তের মুখে পড়তেন। নৈতিক দায় স্বীকার করতেন। কিন্তু রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গ, শাসক দল তৃণমূল। অতএব তদন্তের ফল যদি বা প্রকাশ হয়, দোষ চাপানো হবে এক বা একাধিক অধস্তনের উপরে, এমনই প্রত্যাশিত। ক্ষতিপূরণও ঘোষণা হতে পারে। পাশাপাশি, সরকারি বয়ানের বাইরে যে কোনো তথ্য-প্রমাণকে নস্যাৎ বা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে শাসক দল, সরকারি চিকিৎসকদের ধমক দিয়ে চুপ করাবে, তাও অবধারিত। এটাও আমি বলছি না, সবাই বলছে বলে আপনাকে জানালাম। □

রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গ, শাসক দল তৃণমূল। অতএব তদন্তের ফল যদি বা প্রকাশ হয়, দোষ চাপানো হবে এক বা একাধিক অধস্তনের উপরে, এমনই প্রত্যাশিত।

অতিথি কলম

দুব্বুরি সুব্বারাও

নব্বইয়ের দশক সম্ভূতসম্পন্ন ক্রেতা এবং সাহসী উদ্যোগপতিসমূহ

আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে সাধিত হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। অর্থনীতির সেই রূপান্তর সর্বস্তরে স্বীকৃতও হয়েছে।

২০২৪ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুসারে ভারতীয় জনতার গড় বয়স ২৮.৮ বছর। অর্থাৎ, বর্তমান ভারতের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের একাধিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ১৯৯১ সালে আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে নানা সংস্কারধর্মী পদক্ষেপের আগের পর্যায়ে একটা বড়ো অংশের ভারতীয়কে সহ্য করতে হতো ভয়াবহ অভাব। সেই সময় প্রবল দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা। সে ছিল এক ভিন্ন জগৎ। বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশই সেই দিনগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নন। নব্বইয়ের দশকের সময়পর্ব ছিল অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় ভরা। কিন্তু সেই অস্থির সময় ভারতে দু'টি বৃহৎ গোষ্ঠীর জন্ম দেয়, যা বর্তমান ভারতের অন্যতম শক্তি। এই দু'টি গোষ্ঠী হলো— ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং স্বপ্নদর্শী উদ্যোগপতি।

বিদেশ ভ্রমণে বের হলে সাধারণ ভারতীয়রা পেতেন ২০ ডলার মতো বৈদেশিক মুদ্রা। সেই অর্থ তখন ছিল মহার্ঘ্য। সেই আমলে তিনটি ব্র্যান্ডের সাবান এবং দু'টি ব্র্যান্ডের দাঁতের মাজন বা টুথপেস্টের মধ্যে ব্যবহার্য সামগ্রীটিকে বেছে নিতে হতো। সেটুকুই ছিল সাধারণ মানুষের বিলাসিতা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষত চিনি ও শিশুখাদ্য (বেবিফুড)-এর জন্য প্রতিটি পরিবার কালোবাজারের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতো। কম দামি ক্যামেরা, নিম্নমানের টেপ রেকর্ডার পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেকেই। এইসব জিনিসপত্র পাচার সেই সময় ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। বাড়িতে টেলিফোন বা রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেতে লেগে যেত বহু বছর। অর্থবান শ্রেণীর লোকজনের বাড়িতে রঙিন টেলিভিশন সেট ছিল। সেই সময় রঙিন টিভি আসত বিদেশ থেকে। লাগত ইমপোর্ট পারমিট। সেই আমদানির অনুমতি জোগাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব একমাত্র ধনী ব্যক্তিদেরই ছিল। নিজস্ব ব্র্যান্ডের পাউরুটি তৈরি ও বিক্রিতে সীমিত ছিল সরকারি সাফল্য।

ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর চার দশক ধরে অর্থনীতির প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা। অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকামী এই সরকারি তন্ত্রের দীর্ঘ শাসনে নাগরিকদের নাভিশ্বাস ওঠে। জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে শোচনীয়। এই চার দশক পর দেশে ক্ষমতায় আসে পিভি নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বাধীন সরকার। সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও পুরো মেয়াদে ক্ষমতাসীন ছিল এই সরকার। এই সরকারে অর্থমন্ত্রী ছিলেন ড. মনমোহন সিংহ। তিনি 'এলপিজি' নামক আর্থিক সংস্কারের সূচনা করেন। উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের ফর্মুলা প্রয়োগে আর্থিক মন্দা এবং সেই দুর্বিষহ পরিস্থিতি হতে দেশকে উদ্ধার করেন তিনি। পরবর্তী দশকগুলিতে ভারতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ পর্ব অব্যাহত থাকে। অর্থনীতির প্রসার-সহ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ফলে দেশজুড়ে দারিদ্র্য সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে উল্লেখযোগ্য হ্রাস মনমোহন প্রণীত আর্থিক সংস্কারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৯১ সালে দেশে তীব্র হয়ে ওঠে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের সংকট। দিল্লির ক্ষমতাকেন্দ্রে তখন চলছে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার পৌঁছে যায় তলানিতে। বৈদেশিক ঋণ এবং সেই ঋণের সুদ পরিশোধের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহে, দেশকে দেউলিয়া হওয়া থেকে রুখতে দেশের রিজার্ভ ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় ভারত সরকার। ঋণ গ্রহণ এবং সুদ পরিশোধের যোগ্যতা (ক্রেডিটওয়ার্দিনেস) প্রমাণে, 'ঋণখেলাপি' তকমা এড়াতে সেই যাত্রায় দেশকে তার স্বর্ণভাণ্ডার বিমানে তুলে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সিন্দুকে স্থানান্তরিত করতে হয়। এগুলি হলো দেশের সেই দুর্দিন সংক্রান্ত বিভিন্ন জনশ্রুতির অংশবিশেষ। স্বাভিমানহানির এখানেই শেষ নয়। প্রবল আর্থিক মন্দার গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য আইএমএফের সহায়তার তীব্র প্রয়োজন ছিল দেশের। বহুল প্রচারিত একটি আখ্যান হলো যে, আর্থিক সংকট হতে বেরিয়ে আসার জন্য আইএমএফ ১৯৯১ সালে ভারতকে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে।

আংশিকভাবে হলেও ঘটনাটি সত্য। আইএমএফ স্বাভাবিকভাবেই চাপ দিত যাতে সরকার ভারতীয় মুদ্রার মূল্যের অবমূল্যায়ন ঘটায়। বৈদেশিক মুদ্রার সাপেক্ষে ভারতীয় টাকার দাম পড়ে যাওয়া ছাড়াও আইএমএফের পরামর্শে কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারকে কমাতে হতো ব্যয়বরাদ্দ। বাজেট ব্যয় হ্রাসের বিনিময়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে আইএমএফের তরফে হয়তো মিলত আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এসবের বিপ্রতীপে, অর্থনীতিকে

স্থিতিশীল করার গণ্ডি অতিক্রম করে ১৯৯০ দশকে ভারত বিস্তারিত আকারে শুরু করে প্রশাসনিক কাঠামোগত সংস্কার।

এই সময়পর্বে লাইসেন্স-পারমিটরাজ বিলোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার। আমদানি ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় আর্থিক উদারীকরণজাত নানা সংস্কার। বৈদেশিক ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার ধীরে ধীরে হয় বিনিয়ন্ত্রিত। আর্থিক ক্ষেত্র হয় উন্মুক্ত। সরকারের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকা পালন করত রিজার্ভ ব্যাংক। নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সরকারি ক্যাশিয়ারের ভূমিকা হতে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে অবতীর্ণ হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক।

আইএমএফ এধরনের প্রশাসনিক সংস্কার চাপিয়ে না দিলেও আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে ভারত নিজেই নানা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আর্থিক প্রগতি অর্জনের জন্য ভারতের এই প্রয়াস ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপায়িত হয়। এই বাস্তবায়নের কারণ ছিল মনমোহন সিংহের দৃঢ় প্রত্যয় এবং তাঁর উপর প্রধানমন্ত্রী রাও কর্তৃক পোষিত আস্থা।

এই সংস্কার কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘনিয়ে ওঠা ছিল অনিবার্য। লাইসেন্স-পারমিটের মাধ্যমে সর্বব্যাপী সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও দালালচক্র এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষ, কতিপয় উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা মনে করতেন আর্থিক পরিস্থিতি শোধনের ক্ষেত্রে এই আমূল সংস্কার এবং খোলনলচে পরিবর্তন দ্বারা আলোড়ন সৃষ্টি ইত্যাদি এড়ানো হয়তো সম্ভবপর ছিল। কিছু অর্থনীতিবিদ আর্থিক উদারীকরণকে বিদেশি শোষণের একটি ভয়ংকর পন্থা হিসেবে ভেবেছিলেন। এই মতাবলম্বীদের যুক্তি ছিল উদারীকরণের এই রাস্তায় শোষণের নতুন পরিকল্পনা চলছে; ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সামনে ভারত আত্মসমর্পণ করছে। সর্বোপরি, এই সংস্কার সম্পর্কে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক অজানা আতঙ্ক।

প্রধানমন্ত্রী রাও তাঁর অর্থমন্ত্রীকে পিছন থেকে পুরো মদত দিলেও, সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড়ের দায়িত্বভার অর্থমন্ত্রীর উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। মনমোহন সিংহ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য এবং অর্থমন্ত্রকের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সহযোগিতা আদায়ের জন্য প্রথমেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এই আর্থিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় জনতাসাধারণকে অবহিত করার দায়িত্বটি তিনি পালন করেছিলেন। তাঁর একটি বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিভিন্ন পণ্য ও দ্রব্যের মূল্যের মতোই মুদ্রা বিনিময় হারও কেবল এক ধরনের মূল্য মাত্র। এই কারণে মুদ্রা বিনিময়ের পদ্ধতি ও বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় সম্মান বা স্বাভিমানকে যুক্ত করা অনুচিত।

আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে সাধিত হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। অর্থনীতির সেই রূপান্তর সর্বস্তরে স্বীকৃতও হয়েছে। তুলনামূলকভাবে স্বল্পালোচিত দু'টি বিষয়ের উল্লেখ এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। দু'টি বিষয়ই বিশ্বের দুই প্রান্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবে সর্বতোভাবে সহায়ক হয়েছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ হলো যে কোনো সফল সমাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম উদাহরণটি হলো শিল্প বিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে জাপান এবং কোরীয় উপদ্বীপের যুদ্ধের পরে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাপক আর্থিক উন্নতি। সেই সময়কার দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও স্বল্পোন্নত জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিলক্ষিত হয় অসাধারণ আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। সেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি দিক ছিল সেই দেশের সাধারণ মানুষের উপার্জন বহু গুণ বৃদ্ধি। ইতিহাসের পাতায় সেই অধ্যায়টি— 'দ্য মিরাকল্ অন দ্য হান রিভার' নামে খ্যাত।

নব্বইয়ের দশকের ভারতের আর্থিক সংস্কার পর্বের দ্বিতীয় আরেকটি প্রভাবও ছিল। তা হলো ছোটো-বড়ো-মাঝারি উদ্যোগ, অর্থাৎ নানা প্রকারের শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগস্পৃহার বিচ্ছুরণ ও বিকাশ। নানা কারণে চাপা পড়ে থাকা বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি হয় উন্মুক্ত। শিল্প ও ব্যবসায় আগ্রহী ছিলেন সেই সময় দেশের একটি বড়ো অংশের মানুষ। সবুজ বিপ্লব সাধিত হওয়ার দরুন কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বহুজনের আয় বেড়ে যায় কয়েক গুণ। কৃষিবাবদ আয় দাঁড়ায় উদ্বৃত্ত। সেই পর্যাপ্ত কৃষি আয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রবলভাবে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছিলেন। আর্থিক সংস্কার তাঁদের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রজন্মের উদ্যোগপতিতে পরিণত করে। সংস্কারজাত পরিবর্তনের ফলে দূর হয় শহরকেন্দ্রিকতা বা শহরের প্রতি নির্ভরশীলতা (আরবান-বায়াস)। এর ফলে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধিও ঘটে। বিভিন্ন মাপের উদ্যোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজন ছিল বিনিয়োগ বা অর্থলগ্নি। সংস্কার প্রক্রিয়ার সাফল্য ছিল বিনিয়োগ টানতে এই ক্রমবর্ধমান সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে মেলবন্ধন ও সমন্বয়সাধন।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম কয়েক দশকে দেশজুড়ে প্রবর্তিত হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দর্শনের শাসন। সেই সময় দাঁড়িয়ে তার পক্ষে নানারকমের যুক্তি ছিল, কিন্তু মেয়াদ-উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও ভারতে কোনোভাবে তা টিকে ছিল। ১৯৯১ সালে সেই দর্শন থেকে ক্রমশ সরে আসতে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী/ পূর্বতন সরকার অনুসৃত নীতি থেকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ানোর কারণে প্রধানমন্ত্রী রাও একবার প্রবল সমালোচনা ও প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর উত্তর ছিল যে, তিনি ঘুরে দাঁড়াননি, বরং বিশ্বই তাঁকে কেন্দ্র করে ১৮০ ডিগ্রিতে ঘুরে গিয়েছে।

১৯৯১ সালে ড. মনমোহন সিংহের ঐতিহাসিক বাজেট বক্তৃতা উসকে দেয় ভিক্টর হুগোর স্মৃতি। হুগোর কথা প্রতিধ্বনি করে, তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর কোনো শক্তিই এমন চিন্তাধারাকে থামাতে পারে না, যার সময় এসেছে।' গভীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে একদা দেশসেবা করা ড. সিংহ বিশ্বাস করতেন যে, 'ভারতের সময় এসেছে'। এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে সেই সময় কাজ করে চলা পণ্ডিত, জ্ঞানী ও নম্র অর্থনীতিবিদের উত্তরাধিকার নিশ্চিতভাবে বহন করবে আগামী প্রজন্ম।

(লেখক রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পূর্বতন গভর্নর এবং বর্তমানে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক)

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগামীদিনে ভারতকে সামরিক-শক্তির পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরেও লড়তে হবে

ভারতের সাম্প্রতিকতম মাথাব্যথার কারণ বাংলাদেশকে নিয়ে নয়াদিল্লির উদ্বেগ আপাতত কাটার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের আপত্তিকে আমল না দিয়ে ত্রিপুরায় ভারতীয় সীমান্তের জিরো পয়েন্ট বরাবর বিশাল বাঁধ নির্মাণ করছে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। উদ্বেগ বাড়ছে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ এলাকায়। প্রকৃত অবস্থা কী, সেই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে তুলে দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মাণিক সাহা।

ত্রিপুরার উনকোটি সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে আলিনগর, নিশ্চিন্তপুর ও লালারচক এলাকায় নতুন করে উঁচু ও শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে। বাঁধটি ৬০ ফুট চওড়া এবং ২০ ফুট উঁচু করা হচ্ছে। এই বাঁধ ভারতের কৈলাশহর এলাকার জনগণের কপালে যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের স্থিতাবস্থার কারণে গত পঁচিশ বছর ধরে ভারতের অংশে কোনো বাঁধ মেরামত বা নির্মাণের কাজ হয়নি। ভারি বর্ষণ হলে বাঁধ ভেঙে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যদিও ভারতের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তবে অনেক এলাকায় এখনও বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়নি। বাঁধ না থাকলে বর্ষার সময় বন্যা অবধারিত, যা পুরো কৈলাশহরের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

বিএসএফ বার বার আপত্তি জানিয়েও বাংলাদেশের জিরো পয়েন্টে বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করাতে পারেনি। বিএসএফের অভিযোগ, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি এসব আপত্তিকে আমল দিচ্ছে না। সম্প্রতি উনকোটির জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সীমান্তের এই বাঁধ নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন। বিএসএফ ও স্থানীয় প্রশাসন তাদের পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এর পেছনে চীনের হাত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এমনিতেই বেশ কয়েকদিন যাবৎ ত্রিপুরার সীমানায় নানা অশান্তির খবর আসছে। বিএসএফের অস্ত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে। কয়েকজন বাংলাদেশীকে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করাও হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই অশান্তি হঠাৎ করে ঘটছে না। এর পেছনে বৈদেশিক কোনো শক্তির (পড়ুন চীন) মদত থাকতে পারে। এবং তাঁরা মনে করছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে এই সুগভীর সমস্যাকে শুধু সামরিক শক্তিতে নয়, কূটনৈতিকভাবেও মোকাবিলা করতে হবে।

চীনের ষড়যন্ত্রের এই তত্ত্বে মদত জুগিয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ অন্তবর্তী সরকারের কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের সংবিধান বদল করে সেদেশ থেকে আগেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। সম্প্রতি আরও বড়ো পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। এবার গোটা বাংলাদেশকে চার ভাগে ভাগ করার সুপারিশ করল বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। প্রস্তাব অনুযায়ী, সেদেশে তৈরি হবে চারটি নতুন প্রদেশ। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, দেশের নিরাপত্তা-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া একাধিক বিষয় প্রদেশগুলির হাতে ছাড়া হতে পারে। অনেকটা ভারত বা আমেরিকার মতো বাংলাদেশে কাজ করতে পারে প্রদেশগুলি। এবছরের ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার কাছে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে, তাতে এই বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে।

যে চারটে প্রদেশে বিভক্ত করা হতে পারে বাংলাদেশকে, সেগুলি হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা। অনেকটা উপমহাদেশীয় কাঠামো অনুযায়ী এটা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রদেশগুলির পরিচালন কাঠামো কী হবে, নির্বাচন কীভাবে হবে সেই সব অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। তবে বাংলাদেশে চার 'প্রদেশ' তৈরি হলে যে বড়ো প্রশাসনিক বদল হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের কপালে ভাঁজ পড়েছে বাংলাদেশের আলাদা আলাদা প্রস্তাবিত প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র চরিত্র কীরকম হবে, তা নিয়ে। পুরো দেশটাই যেখানে মোল্লাবাদীদের কবজায়, সেখানে প্রত্যেকটা প্রদেশই যে মোল্লাবাদীরা পরিচালনা করবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমস্যাটা হবে মুখ আর মুখোশের। কোনো প্রদেশ ভারত-বিরোধী দুষ্কর্মে মদত দেবে, অপর প্রদেশ সেই ক্ষতে প্রলেপ দেবে, মোল্লাবাদের এই নয়া চাল সম্পর্কে ভারতকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। আবার দেশ হিসেবে বাংলাদেশ হয়তো ভারত-বিরোধিতায় যুক্ত থাকলো না, কিন্তু সেদেশের সায়ত্বশাসন পাওয়া প্রদেশগুলি পুরোমাত্রায় ভারত-বিরোধী কাজে যুক্ত হলো এবং গোটা বিশ্বের চোখে বাংলাদেশে প্রশাসনের ওপর একাজ থেকে বিরত করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করাও প্রতিবন্ধক হতে পারে স্রেফ এই অজুহাতে। সুতরাং শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে নয়, agamidine বাংলাদেশের সঙ্গে সম্মুখসমরে নয়াদিল্লির কূটনীতিকেও হাতিয়ার করতে হবে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। □

শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে নয়, agamidine বাংলাদেশের সঙ্গে সম্মুখসমরে নয়াদিল্লির কূটনীতিকেও হাতিয়ার করতে হবে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ

চীনা এজেন্ট বামেদের লিগ্যাসি বহন করে চলা মমতা কি জিহাদি শক্তির এজেন্ট হয়ে উঠেছেন

সাধন কুমার পাল

বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মহম্মদ ইউনুস ত্রিমুখী রণকৌশল নিয়েছেন। এক, বাংলাদেশে তীব্র ভারত বিরোধী পরিবেশ ও যুদ্ধ জিগির সৃষ্টি করে বাংলাদেশের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা। দুই, পশ্চিমবঙ্গের ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমান ও সন্ত্রাসবাদী ঢুকিয়ে ভারতে অস্থিরতা তৈরি করে ভারতকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করা। তিন, সীমান্তে ভারতের তরফে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ঠেকানোর অজুহাতে সীমান্তে বাঙ্কার নির্মাণের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি করে ভারতকে চ্যালেঞ্জ করার মতো ভাবমূর্তি তৈরি করে হিরো হয়ে ওঠা।

মহম্মদ ইউনুসের পেছনে রয়েছে জেহাদি শক্তি ও ভারত বিরোধী শক্তির বড়ো অংশ। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত শেয়ার করা রাজ্যগুলি ও কেন্দ্র সরকার ঐক্যবদ্ধ থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ৪০৯৬ কিলোমিটার লম্বা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ ২২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত যে রাজ্যের সঙ্গে সেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূলের আচরণ চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে দেশবাসীর কপালে।

চীনা আক্রমণের সময় ভারতের কমিউনিস্টরা যেমন চীনের এজেন্ট হয়ে কাজ করেছিল, এবার যেন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাদেশের জেহাদি শক্তির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও তার নেত্রীর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষায় ভারত সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার এবং সীমান্ত আগলে থাকা বিএসএফ-কে দুর্বল করার জন্য সব ধরনের প্রয়াসের কথা সর্বজনবিদিত। এখন তৃমমূল কংগ্রেস নেতারা বাংলাদেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতে আরও এককাঠি এগিয়ে যারা বিএসএফের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাঁদেরকেও এক হাত নিচ্ছেন।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ যত আগ্রাসী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেহাদি নেতারা ক্রমশই ছদ্মবেশ ছেড়ে সামনে বেরিয়ে আসছেন। কলকাতাকে মিনি পাকিস্তান, মুসলমান হয়ে না জন্মানো দুর্ভাগ্যজনক, ভারতকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বানানোর সংকল্প ব্যক্ত করার পর তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম এবার বন্দেমাতরম, ভারতমাতা কী জয়, জয় শ্রীরাম ধ্বনির মধ্যেও উসকানি খুঁজে পেতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশের, 'আনসারুল্লা বাংলা'র সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সীমান্তে 'উসকানিমূলক স্লোগান' দেওয়ার অভিযোগ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ৯ জানুয়ারি ২০২৫, কলকাতা পুরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন তিনি। গত ৭ জানুয়ারি মালদায় সীমান্তে বেড়া দিতে গিয়ে বিজিবি'র বাধার মুখে পড়ে বিএসএফ। তখন বিএসএফের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তখন 'বন্দেমাতরম' ও 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান দিতে শোনা যায়

বাম ও মমতার ভোটব্যাংক রাজনীতির সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ আজ জেহাদি শক্তির মরুদ্যান। বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও যে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তা এখন হয়তো মমতা ব্যানার্জি নিজেও বুঝতে পারছেন।

গ্রামবাসীদের। সেই ভিডিয়োর কথা উল্লেখ করে একথা বলেন ফিরহাদ।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের এই দেশবিরোধী সীমান্ত নীতি যে সীমান্ত এলাকার মানুষেরা মানছেন না সেটা সীমান্ত এলাকায় গেলেই স্পষ্ট হবে। মেখলিগঞ্জের আঙ্গারপোতা দহগ্রাম সীমান্তের গ্রামবাসীরা নিজেদের পয়সা খরচ করে কাঁটা তারের বেড়া লাগাচ্ছেন। ঘোষণা করে দিয়েছেন এব্যাপারে তারা কারও বাধা মানবে না। তারা হুমকি দিয়ে রেখেছে বলপ্রয়োগ করলে তারা তিন বিঘা করিডোর বন্ধ করে দেবে।

শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ গ্রামের বাসিন্দারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিএসএফের পাশে দাঁড়িয়েছে। দেশের নিরাপত্তায় আঁচ এলে বিএসএফের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ে তৈরি শিলিগুড়ি মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রাম ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলার বাসিন্দারা। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সীমান্তকে যাঁরা সুরক্ষিত রাখছেন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গ্রামবাসীরা তৈরি। অবিলম্বে উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বিএসএফ অনেক জায়গাতেই খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু করেছে। গত ৭ জানুয়ারি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার শুকদেবপুর এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সময় বাধা দেয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তখনই গ্রামবাসীরা বিএসএফের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। স্লোগান তোলেন বন্দেমাতরম, ভারতমাতা কী জয়, জয় শ্রীরাম। চাপের মুখে পিছু হটে বিজিবি।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকে লালদাসজোত থেকে হাপতিয়াগছ পর্যন্ত প্রায় ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত। মহানন্দার এক পাড়ে ভারত অন্যপাড়ে বাংলাদেশ। একদিকে ফাঁসিদেওয়া উলটাদিকে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার কাশেমগঞ্জ।

ফঃ ২

উভয় দিকেই ঘন জনবসতি। স্থানীয় ধনিয়া মোড়ে তিন কিলোমিটার এবং চটহাটের মুড়িখাওয়ায় দেড় কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত। এখানেই কাঁটাতার বসানো নিয়ে সমস্যা।

২০০৬ সালে ফাঁসিদেওয়া ব্লক সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। গুলিও চলেছিল। তখনও বিএসএফ-কে গ্রামবাসীরা সবরকম সাহায্য করেছিল। এবারও বিএসএফের পাশেই আছে গ্রামবাসীরা এবং তারা জানিয়েছে কাঁটাতারের বেড়া বসাতে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি-সহ দলের নেতা-নেত্রী যখন বিএসএফের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছেন তখন গ্রামবাসীদের বিএসএফের পাশে দাঁড়ানোর দৃশ্য দেশজুড়ে দেশেপ্রেমের এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

মমতা ব্যানার্জি যখন পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানায় বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন, তখন তিনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে শাসক দল সিপিএম এই অনুপ্রবেশকে মদত দিচ্ছে। সেই সময় তিনি সংসদেও এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয় নিয়ে কাঠগড়ায় তুলছেন এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র ভূমিকা নিয়ে আক্রমণ করছেন। একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে রাজনীতির স্বার্থে এ ধরনের ডবল স্ট্যান্ড নেওয়া ছাড়া মমতা ব্যানার্জির কাছে আর কোনো বিকল্প নেই।

একথা পরিষ্কার যে, তৃণমূল কংগ্রেস কোনো আদর্শনির্ভর দল নয়। প্রধানত মমতার ক্যারিশমা ও সংগঠন, একই সঙ্গে প্রশাসন-পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা— এর উপর নির্ভর করেই তৃণমূল পেয়েছে একের পর এক বিরাট জয়। তৃণমূল কংগ্রেস আজ পর্যন্ত নতুন কোনো 'কালচারাল ন্যারোটিভ'-এর জন্ম দিতে পারেনি। এই বিষয়ে তাঁরা বামপন্থী 'লিগ্যাসি'-কেই বহন করে চলেছে। এই জন্যই প্রতুল মুখোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন, কবীর সুমন, নচিকেতা, বিভাস চক্রবর্তীর মতো বাম ঘরানার বহু বিশিষ্ট শিল্পী মমতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর করতে পারেন।

প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর কথাও মনে রাখা উচিত। তৃণমূলের সভা-সমিতিতেও তিনি নিয়মিত গাইতেন 'উই শ্যাল ওভার কাম', 'কারার ওই লৌহকপাট' বা 'থাকিলে ডোবা খানা'-র মতো গান। যেসব গান একদা বামপন্থীদের সভা-সমিতেই তাঁকে গাইতে শোনা যেত।

বামপন্থীরা একসময় পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলতেন। পার্লামেন্টে ঢোকার পর এখন আর ওই গালটি বামেদের মুখে শোনা যায় না। বামপন্থীরা চিরকাল সমস্ত ধরনের ভারতীয় ব্যবস্থাকে শুধু গালাগালি নয়, সুযোগ পেলেই কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে। মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে সেনা জওয়ানদের মৃত্যু হলে বুর্জোয়া শক্তির বিনাশের প্রতীক হিসেবে তারা উৎসব পালন করে। সীমান্ত সুরক্ষায় সদাপ্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ বিএসএফ-কে গালি দেওয়া, নানা অজুহাতে এই বাহিনীকে কালিমালিপ্ত করা ছিল বামপন্থীদের প্রতিদিনের অভ্যাস। বাংলাদেশি জিহাদিদের কীর্তিকলাপকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা, অনুপ্রবেশকারীদের এ রাজ্যে ঢুকিয়ে ভোটার হিসেবে তাদের পালন পোষণ করা বামেদের অন্যতম নীতি ছিল।

বামেদের লিগ্যাসি বহন করে চলা মমতা ব্যানার্জি বিএসএফ-কে আক্রমণ করা, অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে আশ্রয় দেওয়া, জিহাদি তৈরির কারখানা খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে মদত দেওয়ার মানদণ্ডে কিন্তু বামেদের ছাড়িয়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

মমতা ব্যানার্জি বিএসএফের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ এনেছেন। যেমন, বিএসএফ নারী ধর্ষণ করছে, সীমান্তে ভারতীয়দের খুন করে ওপারে ফেলে দিচ্ছে, চোরাচালান করছে ইত্যাদি। এই সমস্ত অভিযোগের একটিও আজ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। বাম ও মমতার ভোটব্যাংক রাজনীতির সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ আজ জেহাদি শক্তির মরুদ্যান। বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও যে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তা এখন হয়তো মমতা ব্যানার্জি নিজেও বুঝতে পারছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদিদের বাড়বাড়ন্তের দায় এড়ানোর জন্য দোষ চাপাচ্ছেন কেন্দ্রের ঘাড়ে।

মমতা ব্যানার্জির কথায়, 'তৃণমূল সীমান্ত পাহারা দেয় না, পুলিশও দেয় না। বিএসএফ পাহারা দেয়। পুলিশের কাছে কিন্তু তথ্য এসে পৌঁছায়, জেলাশাসকের কাছে তথ্য থাকে। ইসলামপুর, সিতাই, চোপড়া এবং আরও অনেক জায়গা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে লোক ঢোকাচ্ছে বিএসএফ। রাজীব কুমারের কাছ থেকে এবং স্থানীয় সূত্র থেকে কিছু তথ্য পেয়েছি আমরা। আমার রিপোর্ট চাই। কড়া চিঠি লিখব আমি। আমরা চাই, ওখানেও শান্তি থাক, এখানেও থাক। আমাদের দুই বাংলার মধ্যে কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই। এক ভাষায় কথা বলি, চিকিৎসার কারণে, মানবিকতার কারণে কেউ আসতেই পারেন। কিন্তু আমাদের জানাতে হবে। এখানে গুন্ডা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত পেরিয়ে এসে খুন করে চলে যাচ্ছে। এমন লোক পাঠানো হচ্ছে। এটা বিএসএফের উপরমহলের কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট আছে এর মধ্যে। নইলে এটা হতে পারত না। বারবার কেন্দ্রকে বলেছি, আপনারা যা করবেন, আমাদের সেটাই পথ। কিন্তু যদি দেখি আমার রাজ্যকে ডিস্টার্ব করতে জঙ্গিহানায় কেউ মদত দিচ্ছেন, তাহলে তো প্রতিবাদ করতেই হবে। আমাদের প্রতিবাদপত্র যাবে।'

ঠিক পাকিস্তান বা বাংলাদেশের স্টাইলে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনলেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর অভিযোগ শুনলে মনে হবে পশ্চিমবঙ্গে যেন ভারতের বাইরে একটি আলাদা দেশ। মমতা ব্যানার্জিকে এবার এই অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিতে হবে, না হলে এনআইএ-র উচিত মমতা ব্যানার্জিকে ডেকে পাঠানো। এই নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে মামলা হওয়া উচিত। মানুষ জানতে চায় প্রকৃত সত্য। ভোটব্যাংকের রাজনীতির নামে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না।

২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৭৮ জন বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে সীমান্ত পাহারা দিতে গিয়ে। এ পর্যন্ত বিএসএফ-কে ১৩৩০টি মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এক মহাবীর চক্র, ১৩টি বীর চক্র, ৬ কীর্তিচক্র, ৩টি শৌর্য চক্র, ৫৬ সেনা মেডেল, ১২৪১ পুলিশ মেডেল পেয়েছে বিএসএফ। দেশ রক্ষার শৌর্য সাহস ও আত্মবলিদানের জন্য বিএসএফ-কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ওরা সিয়াচীনে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় যেমন সীমান্ত পাহারা দেয়, তেমনি রাজস্থানে ৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়ও কাজ করে। এরকম একটি বাহিনীকে ভোটব্যাংক রাজনীতির স্বার্থে অসম্মান করে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা করবে এটা মানা যায় না। □

বাংলাদেশের রক্ত দিয়ে কেনা স্বাধীনতা আজ কলঙ্কিত

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবটা একটা অদ্ভুত রোগে পরিণত হয়ে গেছে। লবণ আনতে পান্তা ফুরালেও অবৈধ অস্ত্র আমদানি করে জেহাদি বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে দেশটাকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা। কথায় কথায় ভারত আক্রমণের দিবাস্বপ্নে বিভোর দেশটির জেহাদিরা। দেশের সমস্ত জেল থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করার মাধ্যমে দেশটি ধ্বংসের এক মহা আয়োজন করে চলেছে। পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আমদানি, সে দেশের সামরিক বিশেষজ্ঞদের সেনা ঘাটিতে এনে জামাই আদরে প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে জোট করতে চলেছে। তারা বেমালুম ভুলে গেছে স্বাধীনতা অর্জনে কী পরিমাণ জীবনহানি, বুদ্ধিজীবী হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, শিল্প কারখানা ধ্বংস করা হয়েছিল। কত রক্ত দিয়ে দেশটির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনে কারা সার্বিক সহযোগিতা করেছে আর কারা শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল তা তারা ভুলে গেছে। কতটা বিশ্বাসঘাতক হলে শত্রুর সঙ্গে প্রেমে মত্ত হতে পারে। সারা দেশের মানুষকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে একচেটিয়াভাবে কোনো নিয়মনীতির কথা না ভেবে একেবারে বেহায়ার মতো পাকিস্তানের সঙ্গে জোট করতে চলেছে বাংলাদেশ।

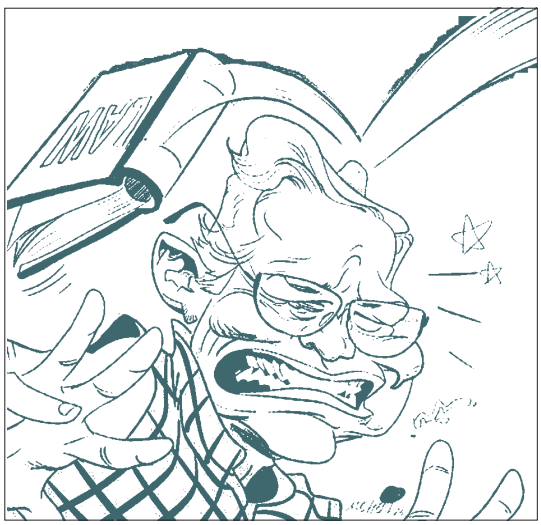

দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে। মানুষ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে দিশেহারা। অথচ ইউনুস সরকার যুদ্ধং দেহি, রণং দেহি ভাব ধরেও ভিক্ষুকের কাছেই ভিক্ষা চাইছেন। সারা দেশ লুটপাট ও গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিচারকের বিচার হচ্ছে দেশটিতে, বিনা অপরাধ ও বিনা বিচারে নিরাপরাধীকে জেলে ঢুকিয়ে মানবাধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে তারা। সারা দেশে হিন্দুদের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার চলছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দেশটির রাজধানীতে গত ১৫ জানুয়ারি জনজাতিদের উপর বর্বরোচিত হামলা করা হয়েছে। ঘটনায় কয়েক হাজার জনজাতি আহত হয়েছে। তাদের হাসপাতালে নেওয়ার পথেও বাধা দিয়েছে সরকারি মদতপুষ্ট জেহাদি বাহিনী। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আহতদের চিকিৎসাতেও বাধা দিয়েছে জামাতপন্থী জেহাদিরা।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে সে দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশের সম্মান ডুবিয়ে দাসখত দিয়ে এসেছেন। অবশ্য অনেকে বলেছেন তাতে বাংলাদেশের সম্মান যায়নি। আসলে দেশটির সম্মানই নেই। থাকলে তো যাওয়ার প্রশ্ন আসে! কথাটি একেবারেই সত্য। পৃথিবীতে নির্লজ্জ ও বেহায়া যদি কোনো দেশ থাকে তা হলে তার নাম বাংলাদেশ। দেশটি পাকিস্তানের সঙ্গে হাত বোঝাপড়ার জন্য শত্রুর সঙ্গে মেলাতেও ছাড়ছে না। বাইডেন, পিটার হাস, ডোনালড লু এবং ক্লিন্টন পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুখের হয়নি। তাই নিরুপায় হয়ে অনেকটা নতুন সন্ধানে পাকিস্তানের দুয়ারে ধরনা দিতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের নিজের নেংটিই মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থা। এর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ভাইকে পেয়ে নিজের নেংটির কথাটাই ভুলে গেছে তারা।

এরই মধ্যে ইউনুস সরকারের পরম আত্মীয় জামাতে ইসলামের একটি দল বড়ো আশা করে চীনে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আম ও ছালা দুইই হারানোর অবস্থা দেখে অবশেষে বিফল হয়ে লেজ গুটিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছেন। সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত পাকিস্তানের সঙ্গে নিঃশর্ত বন্ধুত্ব স্থাপনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সম্মান কতটুকু থাকবে তা কারও বুঝবার বাকি নেই। সম্ভ্রম হারাদের নির্লজ্জতা কোনো বিষয় নয়। যে দেশে সন্ত্রাসী তৈরি হয় সে দেশ নাকি সন্ত্রাস রুখে দেবে! একথা শুনে কার না হাসি পায়? গ্রাম্য একটা প্রবাদ এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে— 'চোর বলে চোরের জ্বালায় বাঁচি না'। সারা পৃথিবীতে যারা অপকর্মের হোতা, তারাই আবার পাকিস্তানি হলে কিংবা বাংলাদেশি হলে হয়ে যায় সাধু। বিষয়টা হাস্যকর বটে। তাই আরও একটা প্রবাদ হলো— 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'।

অন্যদিকে সেনাবাহিনীর একটা অংশ ইউনুস সরকারের আজ্ঞাবাহক হয়ে তার নির্দেশনায় সারা দেশ অঘোষিত সেনা শাসন জারি রেখে জামাত শিবিরকে বিশেষ সুবিধা ও লুটপাটের আশকারা দিয়ে চলেছে। পাকিস্তান থেকে আনা অস্ত্র এখন জামাত শিবিরের হাতে হাতে। জামাত শিবির এখন অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে। কথায় কথায় মানুষ হত্যা তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সূত্র মতে, বাংলাদেশের সেনা ছাউনিগুলিতে অনেক পাকিস্তানি জঙ্গি সরকারের জ্ঞাতসারে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছে। এই জঙ্গিরা পরিকল্পনা করে এগুচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা অস্ত্রের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তারা। সর্বশেষ খবর পর্যন্ত ১ জুলাই ২০১৬ সালে রাত সাড়ে ন'টার দিকে ঢাকার 'হলি আর্টিজেনে' হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িতদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছাড়া পাওয়া সন্ত্রাসবাদীরা এখন নতুনভাবে সংগঠিত হতে

শুরু করেছে। অনেক আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ২০০৪-এর একুশের গ্রেনেড হামলার আসামিদের এমনকী মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিকেও। বাংলাদেশ এই অঞ্চলের জন্য অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে মোল্লাবাদীদের বিকাশের এখন সোনালি সময়। এই সময়ে শেখ হাসিনার আমলে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া সবকটি মোল্লাবাদী গোষ্ঠী আবার অনেক শক্তি সঞ্চয় করে জেগে উঠেছে। অনেক অভিযোগে আওয়ামি লিগকে অভিযুক্ত করা হলেও শেখ হাসিনার শাসনামলে সন্ত্রাসীদের কোনো প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। সে কারণে বিগত দিনে পরাজিত পাকিস্তানের সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষমতার পালাবদলের পরে বাইডেনের পোষ্যপুত্রের পুতুল নাচের রাজনীতি বিশ্ববাসীর কাছে আর লুকানো নেই। দেশের বিকাশ নিয়ে এমন উন্নাসিকতা পৃথিবীতে নজিরবিহীন। হালে দেশটি দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল ভোগ্যপণ্য-সহ যাবতীয় পরিষেবার উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করেছে। এতে জনসাধারণের স্বার্থকে মারাত্মকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ভয়ে কথা বলতে না চাইলেও দরিদ্র ও হতদরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সরকারের শেষের দিন আর বেশি দূরে নেই। শুধু নির্বোধ ও যথেষ্ট পরিমাণে মূর্খ হওয়ার কারণে তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। অন্যদিকে 'জিয়া ওরফানেজ' মামলার আসামি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার নামে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। বেগম জিয়ার ছেলে তারেক জিয়াও লন্ডনে বসে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন বলে জানা গেছে। বিএনপির একটি বড়ো অংশ আওয়ামি লিগের মন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলেও আরেকটি অংশ সারা দেশে জামাত শিবিরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। যার কারণে বিএনপি-ও খুব ভালো অবস্থানে নেই। জনসমর্থন এখন দিনে দিনে কমতে শুরু হয়েছে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের এখন যা অবস্থা তাতে আপামর জনসাধারণ শেখ হাসিনার শাসনকালকেই ভালো বলে স্মরণ করতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ইউনুস সরকারের সখ্য যতই উঁচু মাত্রায় পৌঁছাক না কেন তা অচিরেই ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। সাম্প্রতিক সময়ে ইউনুস সরকারের সকল সদস্যের বিচারের দাবিও উঠেছে। এমনকী দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিও উঠেছে সারাদেশে বেশ জোরালোভাবেই।

বাংলাদেশে হঠাৎ করে অতিমাত্রায় এতো পাগল কোথা থেকে এল বোঝা যাচ্ছে না বলে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। দেশের পাগলের চিকিৎসালয় পাবনা হাসপাতাল কি পাগল শূন্য হয়ে গেছে জেলখানার মতো? অনেকে বলছে পাগলেই চালাচ্ছে দেশ। রাতারাতি সংবিধান পালটানো, জাতীয় পতাকা পরিবর্তন, জাতীয় সংগীত হিন্দু রচিত বলে সেটা বাদ দিয়ে নতুন করে রচনা, নির্বাচন কমিশন-সহ সবকটি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ও পদ্ধতি-সহ বিধিবিধান পরিবর্তনের কাজে ব্যস্ত সব পাগলেরা। সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে পাকা এমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডেকে এনে উপদেষ্টার চেয়ারে বসিয়ে পণ্ডিত ও গণ্যমান্যদের নিগ্রহ করার কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন চলছে জোর কদমে। এর ফলে সাধারণ মানুষের উঠেছে নাভিশ্বাস। তাদের দিকে তাকানোর কেউ নেই। আখের গোছানোর কাজে শাসন-প্রশাসনের সবাই ব্যস্ত। দুর্নীতিতে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রধান উপদেষ্টা যিনি নিজেই আইনের চোখে অপরাধী। তিনি চালাচ্ছেন দেশ। কী মজার দেশ! মগের মুল্লুক দেখার কারও ইচ্ছে থাকলে বাংলাদেশ দেখা তার প্রথম পছন্দ হতে পারে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন তলাহীন, ঋণের দায়ে দেউলিয়া, নীরব দুর্ভিক্ষ, জেহাদি বাহিনীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত। কিন্তু শীঘ্রই যে ও হারিয়ে যাওয়া পাক দুই ভাইয়ের মধুচন্দ্রিমাকাল প্রমাদে পরিণত হতে চলেছে, সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শত্রুদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের এই নতুন আত্মীয়তা বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। কেননা, পাকিস্তানের আঁতুড়ঘরেই বেড়ে উঠছে বর্তমান সরকার এবং তার উপদেষ্টা-সহ উগ্র মোল্লাবাদী জামাত শিবির। □

With Best Compliments from -

SRESTH PRODUCTS PVT. LTD.

Dealing in all kind of edible oil

49, Strand Road,
Kolkata - 700 007

ডাঃ হেডগেওয়ার এবং ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান সভার সভাপতি। মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পরেও তিনি ২০১২ সালে 'হিস্ট্রি টিভি ১৮' আয়োজিত ভারতীয়দের ভোটে 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয়'। অস্পৃশ্য, হতদরিদ্র মহান পরিবারে জন্মানোর পরও সব প্রতিকূলতাকে অবলীলায় হারিয়ে একে একে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স জয় করে ভারতবর্ষের সমাজ, আইন, অর্থনীতি, দর্শনে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় বিশ্বের সেরা ১০০ পণ্ডিতের অন্যতম একজন, এশিয়া মহাদেশে প্রথম পিএইচডি এবং বিলম্বে হলেও 'ভারতরত্ন'। তিনি ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর। সারা জীবন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সরব থেকেছেন। তিনি অন্যতম একজন ভারতীয় যিনি সারা জীবনে একবারও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলে ডাকেননি। ভারত অধ্যাত্ম ভূমির উপর দাঁড়িয়ে হিন্দুত্ব ভাবনাই যে ভারতবর্ষকে অগ্রগতির নতুন দিশা খুঁজে দেবে, এ বিশ্বাস আজীবন পোষণ করেছেন। সারা জীবনে কখনোই কংগ্রেসের কোনো প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত হননি। ইসলাম তোষণের জন্য জওহরলালের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক।

সেই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস আজ ভীষণ রকমে 'দলিত প্রেমে উদ্বেলিত' হয়ে বাবাসাহেব ইস্যুতে দেশবাসীকে ভুলপথে চালিত করছে। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকালে বাবাসাহেবকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার কথা ভাবেননি। অথচ কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বাবাসাহেবকে হারানো নারায়ণ কাজরোলকরকে পদ্মভূষণে ভূষিত করেছে কংগ্রেস সরকার ১৯৭০ সালে। খসড়া সংবিধানের মূল ভাবনাকে পদদলিত করে ৭৫ বার সংবিধান সংশোধন করেছে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্র সরকার। মূল প্রস্তাবনায় না থাকা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দকে জরুরি অবস্থার সুযোগে জোর করে ঢুকিয়েছে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পেশ করা 'হিন্দু কোড বিল' (১৯৫১) সংসদে পাশ করতে না দিয়ে জাতির অগ্রগমন কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই অপমান ও ক্ষোভে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বাবাসাহেব। ১৯৯০ সালে তাঁকে ভারতরত্ন দেওয়া ভিপি সিংহ মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে সংসদের কেন্দ্রীয় হলে তাঁর মূর্তি স্থাপনের প্রতিবাদ জানিয়েছিল কংগ্রেস দল। মুসলমান তোষণের মাধ্যমে রাজনীতিতে টিকে থাকতে চাওয়া কংগ্রেস ঐতিহাসিক 'পুনা চুক্তি' (১৯৩২)-র শুধু বিরোধিতা করেনি, গান্ধী নিজে আমরণ অনশনের ভীতি সঞ্চার করে ভারতবর্ষে দলিত তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন। সেই কংগ্রেস যখন দলিত প্রীতি দেখায় তখন স্বাভাবিক কারণেই তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার প্রশ্ন এসে যায়।

দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষের ইসলামি শাসন এবং পরে খ্রিস্টান শাসনকালে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ঐতিহ্যের যে অবমূল্যায়ন ঘটেছিল, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ভারতবর্ষের যা কিছু নিজস্বতা, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ছিল বাবাসাহেবের। হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন এবং স্বাভিমান ও বৈভবশালী ভারত নির্মাণের আদর্শকে সামনে রেখে ১৯২৫ সালে যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার প্রতি বাবাসাহেবের আবেগ ও সমর্থনের হাজারো প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর 'ড. আম্বেদকর ও সামাজিক ক্রান্তি কি যাত্রা' এবং 'একাত্মতা কী পূজারী বাবাসাহেব আম্বেদকর' গ্রন্থে ড. আম্বেদকরের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্পর্কের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। রয়েছে সঙ্ঘের দর্শন ও আত্মনির্ভরশীল দেশ গঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে বাবাসাহেবের আত্মিক যোগাযোগের অনুভবী বিশ্লেষণ। বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সার্বিক বিকাশ ও বিস্তৃতির মধ্য দিয়েই যে ভারতের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব, তা বিশ্বাস করতেন বাবাসাহেব। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের বক্তব্যে ড. বাবাসাহেবের সারা জীবনের আদর্শের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, 'অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয়, তাহলে পৃথিবীতে আর অন্য কোনো কিছুই পাপ নয়।'

১৯৩৯ সালে পুনায় আয়োজিত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে একদিন এসেছিলেন বাবাসাহেব। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার সেদিন উপস্থিত ছিলেন সেই বর্গে। মোটামুটি ৫২৫ জন স্বয়ংসেবকের উদ্দেশ্যে বাবাসাহেব যখন আন্তরিক প্রশ্ন রাখলেন, 'আপনাদের মধ্যে অস্পৃশ্য কতজন আছেন, আমার সামনে আসুন।' তাঁদের মধ্যে এক জনেরও তাঁর আহ্বানের কোনো উত্তর এল না। ভীষণ আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের মধ্যে মুচি, মেথর, চামার, ঝাড়ুদার সম্প্রদায়ের কতজন আছেন?' প্রায় একশো স্বয়ংসেবক এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাবাসাহেবের সামনে। তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের আদর্শে সমাজের জাতপাত, উচ্চ-নীচ মুছে দিয়ে মানবতার জয়গান গাইতে সক্ষম হওয়া এক উজ্জ্বল সংগঠন। সঙ্ঘই প্রতিষ্ঠা করেছে বাবাসাহেবের 'মানবতাই ধর্ম' আদর্শকে, 'দলিত' মানে 'অস্পৃশ্য' নয় বিশ্বাসকে।

১৯৩৪ সাল সঙ্ঘের ওয়ার্ধা শিবির। সেবারে সঙ্ঘের সেই শিবিরে এসেছিলেন গান্ধীজী। ডাক্তারজী উপস্থিত ছিলেন সেদিন সেই শিবিরে। গ্রীষ্মের সেই শিবিরে গান্ধী একটি আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করলেন। আদুল গায়ে 'ব্রাহ্মণ নিশান' পৈতেবিহীন স্বয়ংসেকদের খাবার পরিবেশন করছেন একদল পৈতেধারী স্বয়ংসেবক। ডাক্তারজীর প্রতি ঘোর লাগা এক প্রশ্ন গান্ধীজীর— 'এটা সম্ভব হলো কী করে?' মুচকি হেসে ডাক্তারজী বললেন, 'আজ বিকেলের আর এক কার্যক্রমে আসুন একবার।' বিকেলে মাঠে গিয়ে গান্ধীজী দেখলেন তুমুল উত্তেজনাময় কাবাডি খেলা চলছে। পৈতেধারী একদল স্বয়ংসেক পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত এক দলিত স্বয়ংসেবকের। অসম্ভব এই দৃশ্যে সেদিন এক ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন গান্ধীজী— 'আমি সারা জীবন যে আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়েছি এবং যাকে বাস্তব রূপায়ণের স্বপ্ন দেখেছি, আজ অবাক হয়ে দেখলাম, আপনার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেটা বাস্তবে করে দেখিয়েছে।'

শ্রীগুরুজীর সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিজমের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন বাবাসাহেব। ১৯৪৮ সালে গান্ধীহত্যার পরে সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেছিলেন বাবাসাহেব। সঙ্ঘের উপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বল্লভভাই প্যাটেল, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখের সঙ্গে তিনিও শুধু সোচ্চার হয়েছিলেন তাই নয়, এক ঐতিহাসিক উক্তিতে বলেছিলেন— 'এই সমাজ ব্যবস্থায় পীড়িত ও বঞ্চিতদের ভেতরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি মতবাদ কমিউনিজম ইতিমধ্যে বিস্তার লাভ শুরু করেছে; দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এটা কোনোভাবেই হওয়া উচিত হবে না। রাষ্ট্রীয় ভাবনায় সঙ্ঘ যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে কমিউনিজমের বিপদ সম্পর্কে। দলিত সমাজ ও কমিউনিজমের মধ্যে যেমন বাবাসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনি উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তারজী।'

হাস্যকর একটি যুক্তি দিয়ে সঙ্ঘ বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে, হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতা ও অধোগতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধমত গ্রহণের অনুষ্ঠান বাবাসাহেব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় শাখা নাগপুরে করেছিলেন। অথচ বাবাসাহেব স্বয়ং নিজের জীবদ্দশায় বলেছেন, 'এই অভিযোগ কোনো অংশেই সত্য নয়।' তাঁর বৌদ্ধমত গ্রহণের এই অনুষ্ঠান নাগপুরে করার অন্যতম কারণ গোটা দেশের কেন্দ্রীয় স্থান এই নাগপুর। উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভারত থেকে সহজে প্রতিনিধিদের আসার জন্যই এই স্থান উপযুক্ত। আরেকটি দিক অবশ্যই স্বীকার্য, দক্ষিণ ভারত কিংবা বঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের ভেতরে অস্পৃশ্যতা যতটা প্রকট ছিল, তুলনায় মহারাষ্ট্র-সহ উত্তর ভারতে তা আরও তীব্র ছিল। তাই প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য নাগপুরকে বেছে নিয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে আইন পড়ার সময় মহারাষ্ট্রের দাপোলীতে সঙ্ঘের শাখায় যাতায়াত করতেন বাবাসাহেব। তার আগে মহারাষ্ট্রের পুণেতে এক শাখায় গিয়ে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে। ১৯৩৭-এর মহারাষ্ট্রের করহাট শাখায় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস বিজয়া দশমীতে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

হিন্দু কোড বিলের মাধ্যমে হিন্দু মহিলাদের ক্ষমতায়নের ও সমানাধিকারের ঐতিহাসিক আইন প্রণয়নের স্বপ্ন কংগ্রেসের গোঁয়ার্তুমি ও অসহযোগিতার জন্য পাশ করাতে না পারার ক্ষোভে পদত্যাগ করেছিলেন বাবাসাহেব নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে। যদিও কখনো কোনো পদের জন্য অপেক্ষা করেননি বাবাসাহেব। এই ঘটনার ঠিক পরেই ১৯৫৩ সালে, সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা মোরপন্থ পিংলে, বাবাসাহেব সাঠে, অধ্যাপক ঠক্কর প্রমুখের সঙ্গে ঔরঙ্গাবাদে বাবাসাহেবের সাক্ষাৎ হয়। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস দল জওহরলালের নেতৃত্বে ক্ষমতায় বসে। দেশগঠনের সেই সূচনাকালে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শই আগামীদিনে দেশকে সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই বৈঠকে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন সঙ্ঘের মোট শাখার সংখ্যা, প্রতি শাখায় অংশগ্রহণকারী স্বয়ংসেবকের সংখ্যা প্রভৃতি। সব তথ্য নেওয়ার পর মোরপন্থ পিংলেকে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'আপনাদের ওটিসি (অফিসার ট্রেনিং ক্যাম্প) প্রত্যক্ষ করে বুঝেছি, আজ পর্যন্ত সঙ্ঘের শক্তি ও শাখা যতটা বাড়া উচিত ততটা হয়নি। আমি চাই সমাজের প্রয়োজনে সঙ্ঘের শক্তি আরও বাড়ুক।' তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন— '১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের শাখার সংখ্যা ১৯৫৩ সালে এত কম কেন! কত সময় লাগবে সমাজকে পরিবর্তন করতে। আমি মৃত্যুর আগে দেখে যেতে চাই, সঙ্ঘ সমাজকে নতুন একটি দিশা দিতে পেরেছে।'

তাঁর সেই আদর্শকে পাথেয় করে প্রথমে জনসঙ্ঘ এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে সেই প্রতিজ্ঞাই সাম্প্রতিক সময়েও বারবার উচ্চারণ করেছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে বাবাসাহেবের সংবিধানের খসড়া পেশের দিন ২৬ নভেম্বরকে 'সংবিধান দিবস' ঘোষণা করেছে। তাঁর জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের মহু, উচ্চ শিক্ষার স্থান লন্ডনের বাড়ি, বৌদ্ধমত গ্রহণের স্থান নাগপুর, মহাপরিনির্বাণ স্থান দিল্লি এবং শ্মশানস্থল চৈত্যভূমি মুম্বাই আজ পঞ্চতীর্থ। সামাজিক ন্যায় ও সামাজিক সমতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রায় ১০ বছরের শাসনে দেশের বিকাশের লক্ষ্যে মাত্র আটবার সংবিধান সংশোধন করেছে। যাদের মধ্যে অন্যতম— ২০১৭ সালে জিএসটি চালু, সর্বভারতীয় তপশিলি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান (২০১৯), একই বছরে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং লোকসভা ও বিধানসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব এবং ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রণয়ন। সংবিধানের মূল সুরকে পাথেয় করে অবলুপ্ত করেছে ৩৭০ ধারা, রদ হয়েছে তিন তালাকের মতো অমানবিক প্রথা।

শূদ্র জাগরণ, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন, হিন্দু সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের পুনর্জাগরণ এবং তার ঐতিহ্য লালনের মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ ভারত নির্মাণ সম্ভব। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাবাসাহেবের আদর্শ এবং তাঁর তৈরি গর্বের সংবিধানই হয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এগিয়ে চলার পাথেয়। □

রাজতন্ত্রে প্রজাতন্ত্র

ইতিহাসের পালাবদল অথবা কাঁঠালের আমসত্ত্ব

সুজিত রায়

এ যেন সোনার পাথরবাটি অথবা কাঁঠালের আমসত্ত্ব। প্রজাতন্ত্র দিবস। কিন্তু রাজাই নেই। রাজা নাই যদি থাকলো, প্রজার অস্তিত্ব কোথায়? তাহলে কি রাজা আছেন, রাজ-অস্তিত্ব আছে বকলমে, নেপথ্যে? যেখানে গণতন্ত্রটা আসলে পর্দামাত্র?

এতো কথা উঠে এল এই ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। এখানেই যদি শেষ হতো, তাও না হয় একটা সান্ত্বনা মিলতো। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো মাথা উঁচু করে জানান দিচ্ছে আরও একটা তথ্য—। কী সেটা?

তাহলো, ভারতের স্বাধীনতা দিবস হওয়ার কথা ছিল এই ২৬ জানুয়ারি তারিখেই। পরে ওই সুকুমার রায়ের বিখ্যাত হ য ব র ল-র মতো সব কিছু রুমাল থেকে বেড়াল হয়ে গেল। ২৬ জানুয়ারি হয়ে গেল সাধারণতন্ত্র দিবস আর স্বাধীনতা দিবস হলো ১৫ আগস্ট।

এই যে কাঁঠালের আমসত্ত্ব বানানোর কাহিনি শোনালাম এর নেপথ্যে রয়েছে অনেক ইতিহাস। সে ইতিহাস যেমন অনেকের জানা তেমনই অনেকের অজানা।

সেই ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেলার আগে আরও একটা বিতর্কের অবতারণা করা যাক। অনেকেই জানেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম পতাকা তুলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ারে যেখানে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের 'কালাপানি'র শাস্তির বিধান দিত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন। কিন্তু ১৯৪৩ সালে নেতাজী যখন সেখানে পতাকা তুললেন, তখনও আন্দামান জাপান অধিকৃত দ্বীপ। অক্ষশক্তিতে জাপানের সহযোগী আইএনএ-সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আন্দামান হস্তান্তর করেছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো। যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়া জুড়ে থাকা আজাদ হিন্দ সরকারের বিভিন্ন কার্যালয় ও দপ্তরগুলির সম্পদ, নথিপত্র, বিভিন্ন সরকারি সনদ ও দস্তাবেজ বাজোয়াপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় কাগজে-কলমে আজাদ হিন্দ সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত বহু নথি আজ নেই। স্বাধীন ভারতের মাটিতে নেতাজী

ইংল্যান্ডে রাজা আছেন, রানি আছেন অর্থাৎ রাজতন্ত্র বহাল। কিন্তু সরকার হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, ভোটে। সেই সরকারের কিন্তু সর্বপ্রধান রাজা বা রানি। ভারতে কি রাজা গিয়ে রাজন্য এসেছে? এ এক অদ্ভুত গণতন্ত্র আর এই গণতন্ত্রই গড়ে দিয়েছিল ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ভিত।

'স্বাধীন ভারতবর্ষের' প্রাইম মিনিস্টার ইন এক্সাইল (Prime Minister in exile) হয়েছিলেন এবং 'স্বাধীন' ভারতের পতাকা তুলেছিলেন।

অবশ্য এর আগে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ভারতবর্ষের তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি (অনেকটা যুবরাজ প্রথার মতোই) জওহরলাল নেহরু। তারিখ, ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আর সেই মঞ্চ থেকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পরের বছর ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে এই তিরঙা পতাকা উড়িয়েই। এখানেও বিতর্ক। সিদ্ধান্তটা কি কংগ্রেসের ছিল? না। গান্ধীজীর সায় ছিল? না। বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদের মত ছিল? না। তাহলে নেহরুজীর সেই ঘোষণা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত?

তা, ব্যক্তির ইচ্ছায় তো দেশের স্বাধীনতা দিবসের দিনক্ষণ ঠিক হতে পারে না। প্রথম বাধা দিলেন স্বয়ং গান্ধীজীই। তাঁর মত ছিল, ভারত তখনও

ঔপনিবেশিকতা মুক্ত নয়। তাছাড়া জনগণের মতামত জানা হয়নি। ভারতবর্ষ তখনও প্রশাসন গঠনের জন্য তৈরি নয়। দেশীয় আইনই তৈরি হয়নি কিছু। সংবিধান তো দূরের কথা, দেশ স্বাধীন হবে বললেই হলো! অতএব বাতিল হলো প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব। তবে হ্যাঁ, ঠিক হলো, যতদিন না ভারতবর্ষ সরকারিভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি পাবে, ততদিন প্রত্যেক বছর ২৬ জানুয়ারি তারিখটি 'পূর্ণ স্বরাজ দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাকা ছিল যে— ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে ২৬ জানুয়ারি তারিখেই। সালটা ঘোষণা করা হবে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই। ইতিমধ্যে চলবে শাসন পরিচালনার জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার কাজ।

ভারতের সংবিধান রচনা— সেও এক ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর থেকে খসড়া কমিটি ১৬৬ বার সংবিধান সভার অধিবেশনে মিলিত হয়। বহু সাধারণ নাগরিকও সভায় হাজির ছিলেন। সেই অধিবেশন চলেছিল টানা দু' বছর এগারো মাস আঠারো দিন। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সংবিধানের খসড়া অনুমোদিত হয় এবং সেই সংবিধান সরকারিভাবে স্বীকৃতি ও রূপায়িত হয় ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি। এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতের সংবিধান রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষেই। যে ২৯২ জন জনপ্রতিনিধি এই সংবিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশনের নির্দেশে। যদিও ওই দিনটিকে 'স্বাধীনতা দিবস' পরিচিতি দেবার কোনো সুযোগই ছিল না। কারণ ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ ছেড়ে তড়িঘড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবং রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে কংগ্রেসও তাড়াহুড়ো করায় বিভাজিত ভারতের স্বাধীনতা জোটে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট অর্থাৎ ভারতীয় সময় ১৪ আগস্ট রাত ১২টার পর। ভারতীয় নেতৃত্বের পূর্ব ঘোষণাকে নাকচ করে দিয়েই ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছাক্রমেই ২৬ জানুয়ারি তারিখটি 'স্বাধীনতা দিবস'-এর মর্যাদা পেল না।

পরিবর্তে ২৬ জানুয়ারি রুমাল থেকে বেড়ালই হয়ে গেল। নামকরণ হলো— প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবসের অর্থ কী? প্রজাতন্ত্র দিবস মানে হলো— প্রজার দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন তন্ত্র। এই তন্ত্রে কোথাও রাজা নেই। মানে রাজতন্ত্র নেই। অর্থাৎ রাজা নেই। রানি নেই। যুবরাজ নেই, যুবরানি নেই। শুধু আছে প্রজা। কেন দেশবাসীকে প্রজা করে রাখা হলো? কেন তারা ফিরে পেল না স্বাধীন মানুষের মর্যাদা? কেন তাঁদের ভোটাধিকার দিয়ে শুধুমাত্র 'গণতান্ত্রিক সরকার' গঠনে সুযোগটুকুই দেওয়া হলো? গণতন্ত্রের বাকি সব সুযোগ সুবিধা কুক্ষিগত হলো শুধু রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতাদের?

প্রশাসন তন্ত্রের বোদ্ধারা বোঝাতে চাইবেন— প্রজাতন্ত্র মানেই গণতন্ত্র। কারণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মূলত প্রজারাই। তা না হয় মানলাম। কিন্তু সংবিধানের গণতন্ত্র কতটা সাধারণ মানুষদের জন্য? এ প্রশ্ন তুলব না, কারণ এ প্রশ্ন করলেই মুখোমুখি হতে হবে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই— ইংল্যান্ডে রাজা আছেন, রানি আছেন অর্থাৎ রাজতন্ত্র বহাল। কিন্তু সরকার হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, ভোটে। সেই সরকারের কিন্তু সর্বপ্রধান রাজা বা রানি। ভারতে কি রাজা গিয়ে রাজন্য এসেছে? এ এক অদ্ভুত গণতন্ত্র আর এই গণতন্ত্রই গড়ে দিয়েছিল ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ভিত। সুতরাং তাতে যে ভেজাল থাকবেই তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নামে গণতন্ত্র, মর্যাদায় প্রজাতন্ত্র, আচারে আচরণে রাজতন্ত্রের শিকার হয়েছিল এতদিন ভারতবর্ষ। □

সাধারণতন্ত্র দিবসের কিছু তথ্য

১. ভারতের সংবিধান বিশ্বের দীর্ঘতম হাতে লেখা সংবিধান।

২. গোটা সংবিধানটি একা হাতে লিখেছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফিস্ট প্রেমবিহারী নারায়ণ। দীর্ঘ পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজটির জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেননি।

৩. মূল সংবিধানটির পরতে পরতে রয়েছে নানা নকশা এবং পুরাণকথা। আছে সর্বপন্থ সমন্বয়ের বার্তা এবং গান্ধীজী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো নেতৃত্বের ছবি।

৪. আবার গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫১। ওজন তিন কিলো ৭৫০ গ্রাম।

৫. সংবিধানে দুটি প্রতিলিপি— একটি হিন্দিতে লেখা। অপরটি ইংরেজিতে।

৬. দুটি প্রতিলিপিই হিলিয়ম পূর্ণ বদ্ধ পাত্রে সংরক্ষিত রয়েছে সংসদের আর্কাইভে।

৭. সংবিধানের প্রতিলিপিগুলিতে প্রথম সই করেছিলেন নির্বাচিত গণ-পরিষদের ৩০৮ জন সদস্য। সই করার তারিখ ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০।

৮. ১৯৫০ সালের প্রথম গণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ।

৯. রাজপথে সাধারণতন্ত্র দিবসের উদ্‌যাপন শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। দিল্লির কিংসওয়েতে এই উদ্‌যাপন হয়েছিল। সেই পথটিই পরবর্তীকালে রাজপথ নামে নামাঙ্কিত হয়।

১০. ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের একটি বিশেষ বৈঠকে রাজপথের নামকরণ করা হয় 'কর্তব্যপথ'।

১১. মূল সংবিধানের নানা আধুনিক সংস্করণ (সাধারণ ও অলংকৃত) তখন খোলা বাজারে বিক্রি হয়।

বাংলাদেশি মুসলমানদের ভারত প্রেম

সম্প্রতি বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৮ হাজার ভারতীয় সেনা প্রাণ দিয়েছে। আহত প্রায় ৫০ হাজার সেনা। ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে খানসেনাদের হাতে। ৪ লক্ষ মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছে বর্বর খানসেনাদের হাতে (যার ৮০ শতাংশ হিন্দু মহিলা)। সেই বাংলাদেশেই মুজিবের মূর্তিতে জুতার মালা পরিয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে। ঢাকা প্রেস ক্লাবে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

জিন্না সাহেবের ৭৬ তম মৃত্যুদিবস পালিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সাংবাদিক পবিত্র কুমার ঘোষ কলকাতার প্রথম শ্রেণীর একটি সংবাদপত্রে ২০০৮ সালের ১৯ জুন একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এখানে তার সামান্য অংশ তুলে দেওয়া হলো— 'আমাদের সৈন্যরা যখন বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিয়েছিল তখনই আমি বুঝেছিলাম যে বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিনই ভারতকে ভালোবাসে না।'

১৯৭১ সালে তাদের যে ভারতপ্রীতি জেগে উঠেছিল তা যে ক্ষণিক তাও আমি জানতাম। তারা ভারতের কাছে প্রেরণা নেবে না। নেবে মক্কা ও পাকিস্তান থেকে। জেনারেল মানেক'শ ইন্দিরা গান্ধীকেও একথা বলেছিলেন। জয়প্রকাশ সহমত পোষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়ে আর একটি পাকিস্তান সৃষ্টি করল। মানেক'শ বলেছিলেন বাংলাদেশ যদি ইসলামি দেশ ঘোষিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

আমার অনুভব

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষের প্রাক্কালে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে এক অভিনব কার্যক্রমের আয়োজন হয়েছিল গত ৪-৫ জানুয়ারি কলকাতার বিনানী ধর্মশালায়। যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রচারক পরিবার মিলন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে এত বছর ধরে সঙ্ঘকার্যের শাখাবিস্তার, দৃঢ়ীকরণ ও পঞ্চপরিবর্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার একটি হলো কুটুম্ব প্রবোধন। প্রায় ৭৯ জন প্রচারকের পরিবারের ২২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। অভিনব পদ্ধতিতে ৭৯ জন প্রচারক পরিবারের সদস্যদের পরিচয় করানো হলো চিত্র-ভাষ্যের মাধ্যমে। বঙ্গপ্রদেশের এই প্রচারক পরম্পরা অনেকের নিকট অজানা ছিল। জানতে পারলাম, কীভাবে অন্য প্রদেশ থেকে প্রচারকরা বঙ্গপ্রদেশে এসে সঙ্ঘ কাজের বিস্তারলাভ করেছেন। দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, বেলুড়মঠ ও কেশব ভবন দর্শনের সুযোগ হলো। কীভাবে স্বয়ংসেবকরা নিজের খরচ বাঁচিয়ে তিল তিল করে টাকাপয়সা জমিয়ে কেশব ভবন (কার্যালয়) তৈরি করেছেন, তাও জানলাম। সেদিন দুপুরে বেলুড়মঠে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেইমতো সবাই আমরা একসঙ্গে প্রসাদ পেলাম। আজকের দিনে যেখানে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরে টুকরো হয়ে যাচ্ছে, সেখানে সবাইকে একই পরিবারের মনে হলো। আমরা যে ছ'জন শ্রীমান অদ্বৈত চরণ দত্তর পরিবার থেকে গিয়েছিলাম, তাদের ফিরতে মন চাইছিল না। একটি বৈঠকে প্রচারক পরিবারের কয়েকজন তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন ৭৯ জন প্রচারক থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গে সঙ্ঘ কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। কেউ কেউ বিভিন্ন সমস্যার কথা বলছিলেন। আমি বলেছিলাম আগেকারদিনে প্রতি বছর প্রচারক বের হতো, সেই পরম্পরা এখন কেন নেই। ৭৯ জন প্রচারক কী যথেষ্ট? বাড়ির একটি ছেলে হলেও তাকে কি ৫ বছরের জন্য সময় দানের প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে? এভাবে যদি হতো তাহলে প্রচারক সংখ্যা চর্তুগুণ হতো, সঙ্ঘকাজ আরও বৃদ্ধি পেত। আর আমরা যারা গৃহী কার্যকর্তা তারা কি সমাজে পাঁচটি পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারি না?

প্রথমত, সামাজিক সমরসতা, জাতপাত, অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করা। এখনো অনেক জায়গায় একই পুকুরে, একই শ্মশানে, একই মন্দিরে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের সুযোগ হিন্দু সমাজের সমস্ত লোকে পায় না। দ্বিতীয়, পর্যাবরণ অর্থাৎ পরিবেশকে রক্ষা করা। প্রকৃতিকে শোষণ করা বন্ধ করা। আগেকার দিনে বটবৃক্ষ ও অশ্বত্থগাছের মধ্যে বিয়ে দেওয়া হতো, যার জন্যে গাছগুলি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতো কেউ কাটতে সাহস পেত না। প্রতিদিন মায়েরা গাছের গোড়ায় জল ঢালতো, বছরে ১ বার বাড়িতে ঘি পোড়ানো হতো, তাতেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পেত। প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, তাই প্লাস্টিক ব্যবহার না করা। পরিবেশ ঠিক রাখতে বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহার করা। তৃতীয়, কুটুম্ব প্রবোধন যা আজকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম। পরিবারের সবাই সপ্তাহে অন্তত একদিন একসঙ্গে ভোজন করা। সবাই একসঙ্গে ঠাকুরঘরে ধ্যান করা।।

চতুর্থ, স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করা। তাতে কিছু ক্ষেত্রে বেশি খরচ হলেও দেশের টাকা দেশেই থাকবে। পঞ্চম, নাগরিক কর্তব্যবোধ। অনেকেই মনে করেন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি যা খুশি তাই করবো। কিন্তু তা নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছতা, সেবা, জলের অপচয় রোধ করা, জলের কল বন্ধ রাকার অভ্যাস করা। সবই সরকার করবে, আর আমরা শুধু ভোগ করবো, এরকম ভাবনা ঠিক নয়। ভোটাধিকার প্রয়োগ করা নাগরিক কর্তব্য। ভোটের দিন ঘরে বসে না থেকে আমার যাকে পছন্দ তাকেই ভোট দেওয়া। এই পাঁচটি পরিবর্তন আনলেই দেশ সমাজ তথা আমাদের প্রভূত উন্নতিলাভ হবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে।

—**নিত্যানন্দ দত্ত,** মাদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

লাভ জেহাদ একটি অশনি সংকেত

কোনো দেশ এবং তার ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে হলে সেই দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত করো, এই ছিল মুসলমান ও ব্রিটিশদের নীতি। এইভাবেই মুসলমানরা নালন্দা, তক্ষশিলাকে ধ্বংস করেছে যা ছিল আমাদের শিক্ষার উপর আঘাত। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হলো আমাদের নারী শক্তি। আমাদের সংস্কৃতির আধার সেই নারী শক্তির ওপর আঘাত হলো লাভ জেহাদ।

ভালোবাসার নামে প্রতারণা এবং প্রতারণার দ্বারা ধর্মান্তরণ হলো লাভ জেহাদ। মুসলমান যুবকরা বেছে বেছে হিন্দু কিশোরী যুবতীদের টার্গেট করছে। মিথ্যে ভালোবাসার জাল বিছিয়ে তারা হিন্দু মেয়েদের ফাঁদে ফেলছে। মুসলমান ছেলেরা প্রথমে হিন্দু নাম ব্যবহার করে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে এবং যখন সেই হিন্দু মেয়েটি জানতে পারছে যে সেই ছেলেটি আসলে মুসলমান, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সমাজে বদনামের ভয়ে সে বাধ্য হয়েই ওই মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে থাকছে হিন্দু বাড়ির সেকুলার দৃষ্টিকোণ, যার ফলে অনেক মেয়েই হিন্দু মুসলমানে কোনো বিভেদ নেই, এই ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে নিজেকে আলট্রা মডার্ন প্রমাণ করতে গিয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করছে। কিন্তু পরিণতি সবক্ষেত্রে একই। প্রথমে হিন্দু মেয়েকে মুসলমান হতে হয়েছে এবং পরে সর্বহারা হয়ে হতে হয়েছে খুন। এই ধর্মান্তরিত ও খুন হওয়া হিন্দু মেয়েদের তালিকায় বামপন্থী পরিবারের সেকুলারবাদী তালিকাও নেহাত কম নয়।

তবে বর্তমানে হিন্দু সমাজের মধ্যে কিছুটা জাগরণ এসেছে, হিন্দু মেয়েরা কিছুটা সতর্ক হয়েছে। কিন্তু লাভ জেহাদের পেছনে অদৃশ্য একটি বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করছে। তাই যখন হিন্দু সমাজ সতর্ক ও জাগরিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে, তখনই এই লাভ জেহাদকে আকর্ষণীয় করে সমাজে পরিবেশন করা হচ্ছে। কোনো প্রসিদ্ধ সেলিব্রেটি দ্বারা লাভ জেহাদের প্রমোশন। এখানে কোনো প্রসিদ্ধ হিন্দু যুবতী ঘটা করে কোনো মুসলমান যুবকের সঙ্গে নিকা করছে।

লাভ জেহাদের বহু উদাহরণ আছে। কিছু সময় আগে অভিনেতা সাইফ আলি খান, হিন্দু অভিনেত্রী করিনা কাপুরকে বিয়ে করে এবং যখন করিনা কাপুর খান সন্তানের জন্ম দেয় তখন তার নাম রাখা হয় তৈমুর। যে তৈমুর লং ভারতে আক্রমণ করে হিন্দু মঠ-মন্দির ধ্বংস করে, হিন্দুদের নরহত্যা করে, তার নামে সন্তানের নাম রেখে কী বার্তা দিতে চায় সাইফ আলি খানের মতো মুসলমানরা?

শুধু তাই নয় করিনা কাপুর হয়ে যান করিনা কাপুর খান। কোনো সাইফ আলি খান তো হিন্দু হতে পারতেন, সেটা নয় কেন? উত্তর একেবারে স্পষ্ট, লাভ জেহাদ ও লাভ জেহাদের প্রমোশন। এরকমভাবে সাধারণ সমাজের মধ্যে লাভ জেহাদের কুচক্রকে কার্যকর করার জন্য সময় সময়ে সেলিব্রিটিদের দ্বারা এরকম উদাহরণ পরিবেশন করা হয়। আমির খান, আরবাজ খান এরকম একাধিক উদাহরণে এটা স্পষ্ট।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হলে কেবল একজন হিন্দুর সংখ্যা কমে যায় না বরং একজন শত্রু বৃদ্ধি পায়। স্বামীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত। হিন্দু যুবতী প্রেমের ফাঁদে মুসলমান হয়ে যে সন্তানের জন্ম দেয় তার পরিচয় মুসলমান হয়, এরাই পরবর্তীতে সেই টুকরো টুকরো গ্যাঙের সদস্য হয়, যারা বন্দেমাতরম বা ভারতমাতা কী জয় বলতে অস্বীকার করে। সুতরাং আমাদের পবিত্র হিন্দু ধর্মের সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু নারীশক্তিকে সচেতন হতে হবে, সচেতন হতে হবে আমাদের সকলকে। প্রতি পরিবারেই এই সচেতনতা আনতে হবে। কোনো হিন্দু বোন যাতে লাভ জেহাদের ফাঁদে না পড়ে সেজন্য বাড়িতেই তাকে লাভ জেহাদের বিষয়ে সচেতন করে যথারীতি সংস্কার দিতে হবে। যারা ভুলবশত চলে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করতে হবে। আর এই কাজ সমস্ত হিন্দু সমাজকেই সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে। আক্রান্ত কোনো হিন্দু পরিবার যাতে মনে না করে যে, সে অসহায় ও একা। হিন্দু সমাজকে এই লাভ জেহাদরূপী অসুরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাহলেই আমরা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারব।

জাগ্রত জনগণ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে দেশের মানুষের চেতনা জাগ্রত হয়েছে, মানুষ নিজেদের স্বাভিমান ফিরে পেয়েছেন। দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে চেতনালুপ্ত ও অসহায় ছিল। সরকারের মুখাপেক্ষী ছিল। জাগ্রত নাগরিক হিসেবে তাদের যে কর্তব্যবোধ রয়েছে সেকথা তারা ভুলে গিয়েছিল। বিগত এক দশকে দেশবাসীর যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

দীর্ঘ বাম শাসনে এবং বর্তমান চোর রাজ্য সরকারের আমলে দুর্নীতির আবহে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরও যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে তার প্রমাণ রাজ্যবাসী রাখতে শুরু করেছে। সম্প্রতি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার সীমান্ত গ্রাম শুকদেবপুরের মানুষ দেশের সামনে উদাহরণ প্রস্তুত করেছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্তে কাটাতাঁর বসাতে গেলে বাংলাদেশের বর্ডার ফোর্স তাতে বাধা দেয়। খবর পেয়ে গ্রামবাসী বিএসএফের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তার ফলেই বিজিবি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর আবার বাংলাদেশের জামাতে ইসলামির কয়েকশো জেহাদি সীমান্ত অতিক্রম করে শুকদেবপুর এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। সেই সময়ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে গ্রামের মা-বোনেরা বটি, হাসুয়া নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। ফলত এবারেও জামাত বাহিনীকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। শুকদেবপুর গ্রামের মানুষ নিজেদের নিরপত্তার জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেরাই যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তা সমগ্র দেশের মানুষের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

—প্রদীপ সরকার,
কৃষ্ণপুর, বৈষ্ণবনগর, মালদা।

আধুনিকতা ও স্বাধীনতার নামে বিপথগমন কাম্য নয়

অদিতি চক্রবর্তী

আধুনিকতা ও স্বাধীনতা, এই দুটো শব্দই একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আধুনিকতা বলতে উন্নতি পরবর্তী ক্রমবিকাশ। আর স্বাধীনতা বলতে সেই বিকাশ অনুযায়ী ক্রমোন্নতি। বর্তমান নারী সমাজে আধুনিকতার নামে যে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে তা অতি দৃষ্টিকটু এবং তা সমাজের আগামী প্রজন্মের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকারক। সবথেকে বেশি যা আমাদের সমাজে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বেড়ে চলেছে তা হলো মেয়েদের জন্য আইন, ক্ষমতায়নের অপব্যবহার। মেয়েদের সুরক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে যে আইনগুলি প্রণীত হয়েছে সেগুলোর অপব্যবহার করছে নারীরা নিজেরাই। অকালপক্কতা এখন দৈনন্দিন জীবনে উঠতি মেয়েদের পক্ষে একটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়োদের দেখা যায় শিশুকন্যার সঙ্গে 'কলাগাছের' তুলনা করতে। বলা হয় মেয়েরা কলাগাছের মতো বেড়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় বাবা-মায়েদের দায়িত্বও দ্রুত বাড়তে থাকে। সমাজের কৌলীন্য-অকৌলীন্যের মধ্যেই মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রথমে বাবা-মায়ের থাকে। কিন্তু আজকের উঠতি বয়সের মেয়েদের যে বালখিল্যতা, অবাধ্যতা, বড়োদের কথা না মেনে চলা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায় সেটা আগামী প্রজন্মের জন্য নিশির ডাক বলা যেতে পারে।

আইনের অপব্যবহারের ফলে নারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্র হ্রাস পাচ্ছে— ১. মহিলাদের সুরক্ষা বিধানে ২০০৫ সালে ভারতীয় সংসদে প্রণীত হয় গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিবিধান আইন। মূলত এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ২০০৫-এর ভিত্তিতে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে ভারতীয় বিচার বিভাগ। গার্হস্থ্য হিংসায় আক্রান্ত মেয়েদের সুবিচার দানের লক্ষ্যে বলবৎ হয়েছিল আইনটি। সম্প্রতি এই আইনটির অপব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে অযথা প্রয়োগ করা হচ্ছে এই আইন। এছাড়াও নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য আইনেরও অপব্যবহার হতে দেখা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ সমাজ সংস্কারকরা সমগ্র নারীজাতির জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তাঁরা চিরস্মরণীয়, তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, সতীদাহ প্রথা রদ এবং নারীশিক্ষার প্রচলন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজে নারীদের উপনয়ন দেওয়ার রীতি রয়েছে। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে মেয়েদের উপনয়ন দেওয়ার বিধি বিদ্যমান। কিন্তু আজকের সমাজে মেয়েরাই মেয়েদের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা কিনা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। এই স্বাধীনতার মধ্যে অবাধ যৌনতাকে বেশি মাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নাইট ক্লাবে রঙিন আলোতে রাতভর বিদেশি নৃত্য, যা কিনা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। সেখান থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের পশ্চিমীকরণ; মদের বোতল আর মেয়েদের নাচে বিভোর হয়ে যাওয়ার সন্ত্রাস। এভাবে প্রকট হতে থাকে হিন্দুনারীর বিপথগামিতার পথ।

এখন বাচ্চা মেয়েরাও বিভিন্ন নেশাতে আচ্ছন্ন হচ্ছে। নেশামুক্তির কথা বললে বেশিরভাগ মেয়ে বলে যে, এটাই তাদের স্বাধীনতা। এর ফলেই নাকি নারীজাতির অগ্রগতি ঘটেছে, স্বাধীনতা পেয়েছে! তাদের পশ্চিমীকরণেই তারা নাকি পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। ছোটো ছোটো ড্রেস, মিনি ফ্রকে আজকের মেয়েরা বুনছে নিজেদের স্বপ্ন, উপভোগ করছে স্বাধীনতা আর হারিয়ে ফেলছে নিজের মর্যাদা ও স্বাভিমান।

নারীরা সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের ভাষায় এগিয়ে যাওয়া মানে পাশ্চাত্যের রীতিনীতিকে অনুসরণ করা, রপ্ত করা। আর ভারতীয় ঐতিহ্যকে ঘৃণা করে ব্যাকডেটেড বলে হাস্যকর করে তোলা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বা ডিজিটাল পোর্টালেই দেখতে পাওয়া যায় ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীরা গায়ত্রী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করছেন তাদের প্রতিটা আবিষ্কার, প্রতিটা সৃষ্টি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গিয়েছে যে, তাঁদের ড্রেস কোড হলো শাড়ি। তাঁরা লিভ ইন, নাইট ক্লাব, নাইট লংড্রাইভকে দূরে সরিয়ে রেখে একাগ্রচিত্তে নিমগ্ন রয়েছেন তাঁদের বিজ্ঞান সাধনায়। রাষ্ট্রনির্মাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তাঁদের কাছে 'রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি'। তাঁরা জীবনকে স্বাধীনতার সুতোতে বাঁধার প্রকৃত উপায়সমূহ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এখনও অনেক মেয়ে সেই বিষয়টি জানেন না।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি পিস্তল চালাতে সক্ষম ছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একা লড়ে গিয়েছেন। রানি লক্ষ্মীবাঈ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, মাতঙ্গিনী হাজরা বিপ্লবী ছিলেন। এই বীরাঙ্গনারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। প্রেরণাদায়ী সেই সব ঘটনা বিশ শতকের মোড়কে কোথাও হারিয়ে গেছে, তাই একবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতির এই অধঃপতন। □

মানসিক সুস্থতার জন্যে নেশামুক্ত হওয়া জরুরি

অজয় ভট্টাচার্য

একটি সিগারেট গড়ে ১৭ মিনিট আয়ু কমিয়ে দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সময়টা ২২ মিনিট। জানাচ্ছেন 'ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন'-এর গবেষকরা। গবেষকদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে এমনই সব তথ্য। নিয়মিত ধূমপানের ফলে গড়ে ১০ বছর আয়ু হারিয়ে যায় জীবন থেকে। এমন নয় যে আয়ুষ্কালের শেষ দশ বছর খোয়া যায় জীবন থেকে। বরং জীবনের মাঝের দশ বছর হারাতে হয় আয়ুষ্কাল থেকে। অর্থাৎ মাঝের অংশ সংক্ষিপ্ত হয়ে বার্ধক্য নেমে আসে দ্রুত। প্রিয়জনের সঙ্গে অসংখ্য সুন্দর মুহূর্ত কাটাবার আগেই সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হয় না-ফেরার দেশে। ধূমপায়ীদের জীবনে বার্ধক্য যে স্বাভাবিক সময়ের আগেই নেমে আসে তা একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে বুঝতে সুবিধা হবে। একজন ধুমপায়ী ব্যক্তি ৭০ বছরের বার্ধক্য লাভ করেন ৬০ বছর বয়সে। সচেতনতার অভাবে অল্প বয়সে ধূমপানে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন অনেকেই। একবার নেশায় জড়িয়ে পড়লে তা থেকে বের হওয়া কষ্টকর। তাই বলে নেশামুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কিছু পদ্ধতি মেনে চললে শুধু ধূমপান নয়, যে কোনও মাদক দ্রব্যের নেশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

তবে সবার আগে জানা প্রয়োজন কেন কোনো ব্যক্তি ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়েন! শুরুতে ধূমপান অনাসক্ত ও বিরক্তিকর। মোটেই সুখকর নয়। কারণ নেশার সঙ্গে শরীর তখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। নিয়মিত ধূমপানের ফলে শরীর ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে নেশার সঙ্গে। তখন ধূমপানের

প্রতি আসক্তি জন্মায়। ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তির রক্তে নিকোটিনের অভাব হলেই শরীর তা পূরণ করতে চায়। তাই ধূমপান ছাড়তে চাইলে ধূমপানের প্রতি এই আসক্তি সর্বাগ্রে দূর করা প্রয়োজন। মনের জোর বাড়িয়ে ক'টাদিন ধূমপান থেকে বিরত থাকতে পারলে, ধূমপানের প্রতি আসক্তি কমতে থাকে। একসময় শরীরও ওই নেশা ভুলে যায়। তবে মনকে শক্ত করতে না পারলে কোনও ড্রাগ ডি-অ্যাডিকশন স্পেশালিস্টের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ড্রাগ ডি-অ্যাডিকশন স্পেশালিস্ট হন। সবার আগে মনকে প্রস্তুত করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করার জন্যে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনকে বোঝাতে হবে যে ধূমপানে অপকার ছাড়া কোনো উপকার নেই। এর বীভৎস খারাপ দিকগুলি মাথায় রাখতে পারলে মনকে বোঝানো সহজ হয়। যদিও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মন কখনোই সুস্থ স্বাভাবিক থাকে না। তাই মনকে বোঝানোটাও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তবে জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এ ব্যাপারে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে জানা যায়, বিবেকানন্দ হয়ে উঠার আগে নরেন্দ্রনাথেরও তামাক সেবনের অভ্যাস ছিল। তাঁর পিতৃদেবের কোচোয়ানের কাছ থেকেই এ ব্যাপারে হাতেখড়ি হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ দত্তের। কোচোয়ান বলত, 'বিলুবাবু, হুক্কা পিয়ো।' অথচ সেই 'বিলু' প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে কু-অভ্যাস ছাড়তে পেরেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করে জগদ্‌বিখ্যাত যোগীপুরুষ হতে পেরেছিলেন। তাই স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন, 'ওঠো, জাগো, নিজের লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।'

'নিকোটেক্স' চুইংগাম ব্যবহার করেও ধূমপান ত্যাগ করা যায়। প্রয়োজনীয় ডোজ জানতে চাইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শুধু ধূমপান নয়, যে কোনো মাদক দ্রব্যের নেশাই ক্ষতিকারক। ধূমপায়ী ব্যক্তির আশেপাশে যারা থাকেন তারাও প্যাসিভ স্মোকারে পরিণত হন। তাই ধূমপান মানে শুধু নিজের ক্ষতি নয়, পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব-সহ আরও অনেকের ক্ষতি। আজকাল চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে যে কোনো ধরনের মাদকের নেশা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া নেশা ত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে সমাজে অন্যদেরও মাদক ছাড়তে উৎসাহী করে তোলা যায়। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সহজ হয়। স্বামীজীর মতে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই মনুষ্যত্ববোধ গড়ে উঠে। আর এই বোধ যাঁদের আছে তাঁরাই দেশের ও দশের সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন। তবে নিজেকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সবার আগে মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন।

প্যারেডে অংশগ্রহণকারী
স্বয়ংসেবক
শ্রী বিজয় কুমার

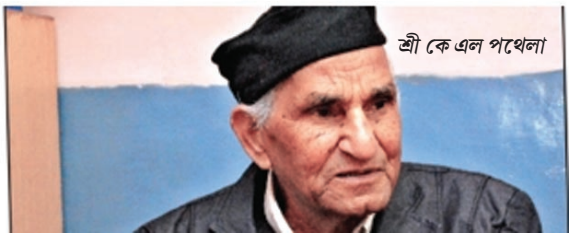

শ্রী কে এল পথেলা

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে স্বয়ংসেবকদের অংশগ্রহণ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ক্লাবঘরে আড্ডা চলছে। তর্ক শুরু হয়েছে তপন, প্রকাশ আর অজয়ের মধ্যে। তপন পাঁড় কংগ্রেসি, প্রকাশ সিপিএমের, আর অজয় শাসক দলের সমর্থক। আমি কোনোদিনই সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলাম না। আবাল্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। অজয় বলে, রাজ্যে সিপিএম-কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাত আছে। তাই টিএমসিকে হারাতে সিপিএম-কংগ্রেস তলে তলে বিজেপির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করে চলেছে। আমি চুপ করে শুনছিলাম। ওদের রাজনীতির আলোচনায় ঢোকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম কখন ওরা ওদের আলোচনায় সঙ্ঘ-কে টেনে আনে। কারণ আজকাল এরা যেকোনো আলোচনায় সঙ্ঘকে টেনে আনবেই আনবে। আমার ভাবনা সত্যি হতে বেশি সময় লাগলো না। শিগগিরই প্রকাশ টেনে আনল সঙ্ঘ প্রসঙ্গ। শাসক দলের অজয়ও ছাড়বার পাত্র নয়। বলতে শুরু করলো কংগ্রেস-সিপিএম কীভাবে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে বিজেপি ওসঙ্ঘের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

তাদের রাজনৈতিক আলোচনায় সঙ্ঘের নাম আসাতে নিজের জিভকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকে পড়লাম তাদের আলোচনায়। বললাম, ভাই তোমার বিতর্ক কংগ্রেস-সিপিএম-টিএমসি-বিজেপির মধ্যেই থাক না। এর মধ্যে সঙ্ঘকে টেনে আনা কেন? সঙ্ঘ-তো সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণও করে না, আর কোনো দলের হয়ে প্রচারও করে না। এমন 'বাবুরাম সাপুড়ে' মার্কা 'কাউকে না কাটা' নির্বিষ সংগঠনকে নিয়ে তোমাদের বিতর্ক কেন। আরএসএস তোমাদের কোন পাকা ধানে মইটা দিয়েছে? ব্যাস, আগুনে যেন ঘি পড়ল। আশ্চর্যজনকভাবে এবার তপন প্রকাশ অজয় একজোট। চেঁচাতে লাগলো, 'নির্বিষ? আরএসএস নির্বিষ? আরএসএস হলো বিজেপির রিমোট কন্ট্রোল। আর কে না জানে আরএসএসের মতো ফ্যাসিবাদী দেশবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে সামনে রেখে এ দেশের সর্বনাশ করে চলেছে।' আমি একা। তাদের তিনজনের গলার সঙ্গে একা পেরে উঠব কেন? বললাম, 'শোনো। তোমরা তিনজনে একসঙ্গে চেঁচালে হবে না। একে একে যুক্তি দিয়ে বলো, আমি তোমাদের সঙ্গে তর্কে যেতে রাজি আছি।'

তপন বলে, 'তোমরা দেশবিরোধী, সাম্প্রদায়িক। তোমরা মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছো, ফ্যাসিস্ট। সেজন্যই তো এদেশে তিন তিনবার আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।' আমি বলি, ''আমাদের তিনবার ব্যান করা হয়েছিল এটা সত্যি। আর এও সত্যি যে সেই তিন-তিনবার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে। আর সেটা করেছিল তোমাদের কংগ্রেস সরকার। তবে আরএসএস গান্ধী হত্যা করেছে— একথা আর প্রকাশ্যে বোলো না। বললে হয়তো তোমাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা বা মানহানির মামলা হয়ে যেতে পারে, যেমন তোমাদের নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এই নিয়ে কেস চলছে। আসলে কী জানো, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস চেয়েছিল আরএসএস তাদের শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করুক, তাদের কথামতো চলুক। সঙ্ঘ এতে রাজি না হওয়ায় ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার অপবাদ দিয়ে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর তদন্তের জন্য 'জাস্টিস কাপুর কমিশন' গঠনও করা হয়েছিল। কিন্তু কমিশন এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ

না পাওয়ায় এবং সঙ্ঘের আন্দোলনের চাপে নেহরু শেষ পর্যন্ত ১১ জুলাই ১৯৪৯ আরএসএসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন— এই তথ্য কি তোমাদের জানা আছে? পরের ইতিহাসটাও শোনো। তোমরা তো আজকের যোগী, সঙ্ঘকে সাম্প্রদায়িক বলো, অবশ্য তোমাদের ফোরফাদার জওহরলালও একসময় সঙ্ঘকে তাই বলতেন। কিন্তু এটা কি জানো এই জওহরলালই ১৯৬৩ সালে পাক্কা দেশভক্ত সংগঠন বলে উল্লেখ করে ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সঙ্ঘকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?"

ওরা তো আমার কথা শুনে অবাক! সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে আরএসএস! তা আবার হয়েছিল নাকি? আমি বলি, 'সালটা ছিল ১৯৬২। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীনের ক্ষমতায় তখন মাও সে তুং এবং চৌ এন লাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ভারত সরকার তখন চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে মরিয়া। চৌয়ের ছলাকলায় ভুলে নেহরু 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' স্লোগানের মৌতাতে বিভোর। তারিখটা ছিল ১০ অক্টোবর। বন্ধুত্বের আড়ালে কখন যে চৌয়ের বাহিনী ভারত চীন সীমান্ত 'ম্যাকমোহন লাইন' টপকে ভারতের ভেতরে ঢুকে পড়েছে জওহরলাল তার খবরই পাননি। যখন পেলেন ততক্ষণে ড্রাগন সেনা আমাদের দেশের লাদাখ, অরুণাচল, আকসাই চীন-সহ ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার দখল করে নিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নেহরু প্রতিরোধে নামলেও তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। একদিকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত চীনা সৈন্য, অন্যদিকে অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনা। হাতে আধুনিক অস্ত্রও অপ্রতুল। ফল যা হওয়ার তাই হলো। ১০ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর, প্রায় দেড় মাসের যুদ্ধের নিট ফল চীনের হাতে ভারতের শোচনীয় পরাজয়। আর তিন হাজারেরও বেশি ভারতীয় সেনার মৃত্যু। অদৃষ্টের পরিহাস দেখো, ১৯৪৭ সালে এই নেহরুর হাতে একদিন ভারত ভেঙে তিন টুকরো হয়েছিল, আবার ১৯৫০ সালে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ভূস্বর্গ কৈলাস মানস সরোবর-সহ ভারতের বিশাল ভূখণ্ড 'তিব্বত' চীন জোর করে কেড়ে নিয়েছিল, আবার ১৯৬২-তে তাঁর আমলেই চীনের কাছে ভারত নতুন করে হারালো ৩৮ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি।

প্রকাশ বলে, 'তোমরা তো নিজেদের নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী বলো, আরএসএস-এর জন্ম ১৯২৫ সালে। ১৯৬২ সালে যুদ্ধের সময়ে আরএসএস-এর ভূমিকা কি ছিল'? আমি বলি, 'সেটা বলছি, তার আগে তুমি বলো তোমরা কমিউনিস্টরা সেদিন কী করেছিলে? তোমরা তো এই যুদ্ধে চীনের পক্ষ নিয়েছিলে। যে চীন ভারত আক্রমণ করল তাকে নিরপরাধ সাজতে তোমরা সেদিন প্রচার করেছিলে যে চীন ভারতকে আক্রমণ করেনি, বরং ভারত অন্যায়ভাবে চীনকে আক্রমণ করেছে। কী কবোনি? তোমাদের নেতা চারু মজুমদার তোমাদের মুখপাত্র 'দেশব্রতী'তে ১৯৬৯ সালের ৬ নভেম্বর সংখ্যায় লিখেছিলেন, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। চীনের পথই আমাদের পথ'। কী, মনে পড়েছে কিনা? তোমাদের চারআনা আটআনা কমরেড-কমরেডিরা আজও পাড়ার মোড়ে মাইক হাতে এই কথা বলে বেড়ায়। কী, বলে না? শুধু তাই নয়, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ে ও চীনের জয়ে তোমরা আনন্দও করেছিলে! কোন মুখে তোমরা আরএসএসের কথা বলো?

তবু বলি শোন, ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ চীনের এই আক্রমণকে জাতীয় অখণ্ডতার উপর আঘাত বলে অভিহিত করেছে, দেশের নাগরিকদের মনোবল বাড়াতে মিটিং-মিছিল-সমাবেশ করেছে, সেনা ছাউনিতে খাদ্য-ওষুধ- রসদ জোগান দিয়েছে, আহত সৈন্যদের জন্য রক্তদান শিবির করেছে, সৈন্যদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা করেছে, এমনকী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে। চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শুধু কঠোর প্রতিক্রিয়া দেওয়াই নয় এই যুদ্ধে সঙ্ঘ সর্বতোভাবে ভারত সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল, দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের মতো চীনের সমর্থনে মাঠে নামেনি। ১৯৬২ সালে আরএসএস নেহরুর 'হিন্দি চীনী ভাই ভাই' স্লোগানের বিরোধিতা করলেও, সরকারের কট্টর সমালোচনা করলেও যুদ্ধের সময়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ যুদ্ধে হতচকিত সরকার সেদিন দিল্লি পুলিশকেও পাঠিয়ে দিয়েছিল সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য।

১০ অক্টোবর থেকে একুশে নভেম্বর, প্রায় দেড় মাসের যুদ্ধে পুলিশহীন দিল্লির ট্রাফিক অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবা সেদিন সামলেছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। দেশের দুঃসময়ে স্বয়ংসেবকদের এই কর্তব্যপরায়ণতা সবার প্রশংসা পেয়েছিল। সঙ্ঘ বিরোধী নেহরুও এতে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হলে লাঠি নিয়েও বোমার মুখোমুখি হওয়া যায়'। এই কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৬৩ সালের ২৬ জানুয়ারি দিল্লির সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশ নিতে আরএসএস-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মাত্র তিনদিনের নোটিশে সঙ্ঘের ৩৫০০ স্বয়ংসেবক তার নিজস্ব ব্যান্ড সহযোগে পূর্ণ গণবেশে (ইউনিফর্ম) সামরিক শৃঙ্খলায় দিল্লির সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশ নিয়েছিল। কংগ্রেস নেতারা সেদিন নেহরুকে প্রশ্ন করেছিলেন, আরএসএস কেন সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করেছে'? উত্তরে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি কমিটির সভায় নেহরু বলেছিলেন, 'অনেক দেশভক্ত সংগঠনকে কুচকাওয়াজে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়েছিল, আরএসএসও যোগ দিয়েছে'।

এবার বুঝেছ তো তোমাদের গডফাদার নেহরুও সঙ্ঘকে দেশভক্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তপন বলে, 'বাবা, এতকিছু আমরা তো কোনোদিন শুনিনি! আমাদের নেতারা যে বলে— আরএসএস মানেই সাম্প্রদায়িক, গান্ধী হত্যাকারী, মুসলমান বিরোধী, দাঙ্গাবাজ, উগ্র হিন্দুত্ব, মানুষে মানুষে বিভেদ, আর দেশ ভাঙার ষড়যন্ত্র?' আমি বলি, 'যে নেতারা সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এইসব বলে তারা কি সঙ্ঘকে কখনো কাছে থেকে দেখেছে? সঙ্ঘের শাখায় এসেছে? সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে মিশেছে? আচ্ছা, আমি তো ছোটোবেলা থেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। আমাকে কি তোমাদের ওইরকম উগ্রবাদী বলে মনে হয়'? তপন বলে, 'না না তুমি মোটেও এমন নও'। আমি বলি, 'আমি যদি ওরকম না হই, আমি যদি দেশ না ভাঙতে পারি, আমি যদি মানুষে মানুষে বিভেদ না করি, আমি যদি দাঙ্গাবাজ না হই, তবে সঙ্ঘ কী করে খারাপ হবে? সঙ্ঘ তো আমার মতো ছেলেদের নিয়েই তৈরি। তোমাদের যে নেতারা সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এইসব বলে তারা তোমাদের ভুল বোঝায়। নেহরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই, এঁরাও যতদিন দূর থেকে সঙ্ঘকে দেখেছিলেন ততদিন তোমাদের মতো ভুল করতেন। তারপর যেদিন থেকে সঙ্ঘের কাছে এলেন, সেদিন থেকে তাদেরও ভুল ভেঙেছিল। তারাও সঙ্ঘের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। সত্যিই যদি সঙ্ঘকে আরও বেশি করে জানতে চাও তবে সঙ্ঘের কাছে এসো, সঙ্ঘের বই পড়ো, সঙ্ঘের দর্শন জানো'।

এসব শুনে তপন, প্রকাশ, অজয়ের মুখে একটা সন্তুষ্টির ছবি ভেসে উঠছিল। রাত ৯টা বাজে। আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি। ভোরে উঠে দিল্লিতে সেনাবাহিনীর প্যারেডের অনুষ্ঠান দেখতে হবে। তাই বেশি রাত করা উচিত নয়। ক্লাব থেকে বেরিয়ে হাঁটা দিলাম ঘরের উদ্দেশে।

কংগ্রেসি শাসনকালে আক্রান্ত ও রক্তাক্ত ভারতের সংবিধান

৫৫ বছরের শাসনকালে কংগ্রেসকৃত যে সব সংশোধনী ভারতের মানুষকে গণতন্ত্রের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রেখেছে তা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা ভারতবর্ষের বর্তমান নেতৃত্বকেই ভাবতে হবে।

দেবজিৎ সরকার

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দুই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণকারী কংগ্রেস যে খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে এল, তারপর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণতন্ত্র শব্দটিকে সামনে রেখে দেশ কেমনভাবে চলবে তার দিক নির্ণয় করার জন্য স্বাধীন ভারতের গণপরিষদে জাতীয় নেতৃত্বের সামনে ভারতের সংবিধান আত্মপ্রকাশ করে। এই সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়।

উপরের এই সব ঐতিহাসিক তথ্য ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে দশম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে পাঠ্য হিসাবে থাকায় প্রায় সবাই এই সব কথা জানেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছরের মধ্যে ৫৫ বছর শাসন করেছে কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটি। এই দলটি প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের কীভাবে পদে পদে অপমান, অবমূল্যায়ন ও প্রতারণা করেছে তা অনেকেরই জানা নেই। বলাবাহুল্য, কংগ্রেস দলটিকে সামনে রেখে নেহরু-গান্ধী পরিবার ভারতের সংবিধানের জন্মলগ্ন থেকেই সংবিধানকে পদদলিত করেছে।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সদ্যঃপ্রসূত গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানটি প্রথমবার আক্রান্ত হয় তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্বারা। যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। গণপরিষদে নেহরু যা করতে পারেননি ১৯৫১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে সংবিধান কার্যকরী হবার বর্ষপূর্তির আগেই নেহরু প্রথম সংবিধান সংশোধন করেন। বাকস্বাধীনতা খর্ব, জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক রাজনৈতিক কারসাজি করে ভবিষ্যতের

ক্ষমতা দখলের জন্য রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করতে শুরু করেন। বাকস্বাধীনতা যা গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান শর্ত, যাকে ভারতের সংবিধানে প্রভূত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই অধিকারকে খর্ব করে সংবিধানের চেতনাকে রক্তাক্ত করেছিল নেহরু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। তা করেছিল সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, জিভি মভলঙ্কর, কংগ্রেস নেতা জেবি কৃপালানি, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সংবিধানকে ছুরি মারার এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেও জওহরলাল নেহরু সেই সব প্রবীণ নেতাদের কথায় কোনোরকম কর্ণপাত করেননি। দেশের সংসদকে এড়িয়ে ১৯৫৪ সালে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার জারির মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৫-এ ধারা ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইন্দিরা, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া! সংবিধান হত্যা করার ব্যবস্থায় কংগ্রেসি অপকর্মের যে বীজ নেহরু বপন করে গিয়েছিলেন তাকে ফুলে-ফলে পূর্ণতা দিয়েছিলেন তাঁর কন্যা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

ইন্দিরার আমলে সংশোধনের নামে শুধু নয়, সরাসরি জরুরি অবস্থা জারি করে সরকার চালানোর নামে সংবিধান হত্যা যথাযথ পূর্ণতা পায়।

১৯৬৭ সালে Golaknath vs. State of Punjab 1967 AIR 1643, 1967 SCR(2) 762 মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ১১ জন জজের কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চের রায়ে এটি পরিষ্কার হয় যে, পার্লামেন্টকে সামনে রেখে কোনো সরকার সংবিধানকে খর্ব করতে পারে না। কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য সরকারের মামলায় ১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের ১৩ জন বিচারপতির সমন্বিত সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দেয় যে, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোটির পরিবর্তন করতে পারবে না ভারতীয় সংসদ।

প্রায় একই সময় ১৯৭৫ সালের একটি নির্বাচনে আদালত যখন ইন্দিরা গান্ধীর জয়কে অন্যায্য বলে ঘোষণা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে সামনে রেখে ২৫ জুন ১৯৭৫ সাল থেকে ২১ মার্চ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ২১ মাসের জরুরি অবস্থা তৎকালীন ইন্দিরা কংগ্রেসের সরকার জারি করে, যা স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগ হিসেবে ইতিহাসে লেখা রয়েছে।

যেকোনো রকম বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার এই মহাযজ্ঞে তৎকালীন ইন্দিরা সরকার ভারতবর্ষের মানুষকে নিপীড়ন করার লক্ষ্যে মেন্টেনেন্স অব ইন্টার্নাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের (MISA) অপপ্রয়োগ করে এবং সারা ভারতে প্রায় এক লক্ষের ওপর বিরোধী নেতা, সাংবাদিক এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের জেলবন্দি করে অকথ্য অত্যাচার চালায়।

সংবিধান বলে সব কিছুর অবস্থান বা বৈধতাকে সরাসরি আক্রমণ ও রক্তাক্ত করেছিল ইন্দিরা গান্ধী সরকার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতা কোনো কিছুই ওই একুশ মাসের ভারতবর্ষ দেখেনি। সবকিছুই ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার বাজেয়াপ্ত করে রেখেছিল। জরুরি অবস্থা জারি থাকাকালীন ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী এনে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্যন্ত পালটে দেন।

এডিএম জবলপুর বনাম শিবকান্ত শুক্লা মামলায় জাস্টিস এইচআর খান্নার উপর ইন্দিরা গান্ধী যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন। তার কারণ জাস্টিস খান্নারাই ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা করেছিলেন। সেই জন্য সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী চিফ জাস্টিস হিসেবে তিনি জাস্টিস খান্নার মনোনয়নকে বাতিল করেন। এইভাবে ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার উপর সরাসরি আক্রমণ করে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর শাসনকালে এই আক্রমণ একই রকমভাবে বলবৎ রেখেছিলেন।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাপুত্র রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার একই ধারা বজায় রেখেছে। বিখ্যাত শাহবানু মামলায় যখন যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত শাহবানুর খোরপোষের পক্ষে রায় দিয়েছিল, তখন রাজীব গান্ধী সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে সংবিধান সংশোধন করে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করেন। যার কুফল আজ পর্যন্ত ভারতের অগণিত তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলা ভোগ করছেন এবং আজও ওই আইন ভারতবর্ষের সকল নাগরিকের সমান অধিকারপ্রাপ্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

১৯৮৫ সালের এই রায় এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকারের নতুন আইন দ্য মুসলিম উইমেন অ্যাক্ট প্রণয়ন ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যা সরাসরি সংবিধান লঙ্ঘন করার শামিল। এরপরে ২০০৪ থেকে ২০০৮ গান্ধী পরিবার সরাসরি সরকারে অংশগ্রহণ না করলেও কংগ্রেসকে সামনে রেখে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। সরকারের 'অন্তরাত্মা' বলে খ্যাত সোনিয়া গান্ধী বিভিন্ন সময় নরসিমা রাও ও মনমোহন সরকারকে পদে পদে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছেন। সঞ্জয় বারুর বিখ্যাত বই 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' এবং তৎকালীন অন্যান্য রচনায় এর প্রামাণ্য বারবার মিলেছে। যে সময় সরকারের পাশাপাশি নেহরু-গান্ধী পরিবার একটি সমান্তরাল ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

রাজীব গান্ধীর পর অ্যান্তোনিও মাইনোর (সোনিয়া গান্ধীর) সময় সরাসরি সরকারি ক্ষমতার বাইরে থাকা নেহরু-গান্ধী পরিবার এক অদ্ভুত জিনিস তৈরি করে যা কিনা সংবিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী একটি বিষয়। ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের মাথায় সোনিয়া গান্ধীকে বসানো হয়।

মনে পড়ে রাহুল গান্ধীর লোকসভায় দাঁড়িয়ে একটি রেজোলিউশনকে ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা, ২০১৩ সাল। যে সময় কিনা দোষী সমস্ত আইন অর্থাৎ কোনো আইন প্রণেতা যদি দোষী সাব্যস্ত হন, আদালতের দ্বারা তাহলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করার ক্ষমতা ভারতীয় গণতন্ত্রের আছে বলে যে ঘোষণা হয়েছিল, তার বিরোধিতা করেন। রাহুল গান্ধী এই কাজ করার ফলে তৎকালীন কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং ওই রেজোলিউশন আর কার্যকরী হয়নি।

কিন্তু ৫৫ বছরের শাসনকালে কংগ্রেসকৃত যে সব সংশোধনী ভারতের মানুষকে গণতন্ত্রের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রেখেছে তা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা ভারতবর্ষের বর্তমান নেতৃত্বকেই ভাবতে হবে। সংবিধানের বিভিন্ন বিভিন্ন ধারার অযোগ্য ও অশুভ সংশোধনী যেগুলো কংগ্রেস আমলে নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে এসেছে, সেগুলোর অবিলম্বে পরিবর্তন প্রয়োজন, কোনো পরিমার্জনের প্রয়োজন যদি না থাকে তাহলে সরাসরি সেগুলোকে বাতিল বলে গণ্য করতে হবে এবং সংবিধানকে তার ১৯৫০-এর যে চেহারা ছিল সেই চেহারায় ফিরিয়ে আনা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। কংগ্রেসি আমলে সংবিধান সংশোধনের নামে যে পাপকর্মকে ভারতের জনসাধারণের মতের বহিঃপ্রকাশ বলে চালানো হয়েছিল তা অবিলম্বে বাতিল করা প্রয়োজন এবং ভারতের সংবিধানকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার । তা নাহলে ভারতের মানুষ বিশ্বের বাকি গণতন্ত্রহীন দেশগুলির মানুষ যেরকমভাবে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের দ্বারা অত্যাচারিত হন সেইরকমভাবে অত্যাচারিত হবেন। আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ববরেণ্য বীর সন্ন্যাসী, যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী এক মহতী কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। ১০ জানুয়ারি বড়িশা শশীভূষণ জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ ভবনে বিদ্যাপীঠেরই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের উদ্বোধনী গানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হয়। প্রথম দিনের প্রথম পর্বে প্রাস্তবিক বক্তব্য প্রদান করেন বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের উপর এক কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ক্যুইজ মাস্টার মৈনাক চ্যাটার্জি ও সুমিত ব্যানার্জিকে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

বিদ্যাপীঠের পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য স্বামীজীর উপর এক চিত্তাকর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। স্বামীজীর বাল্যকাল থেকে সন্ন্যাস জীবন, সারা ভারতে পরিব্রাজক রূপে পরিভ্রমণ, শিকাগো বক্তৃতা-সহ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা বিষয় কুইজের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

প্রতিযোগিতার পর বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। বক্তব্যের পর প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলের হাতেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য সমস্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন দেবাশিস দে, দিব্যেন্দু মুখার্জি ও অরিজিৎ রায়। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ।

১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে স্বামীজীর জন্মদিবসে পর্ণশ্রী বিবেকানন্দ কাননে স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যার্পণ ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন পাঠচক্রের সহ সভাপতি নিমাই চাঁদ দত্ত। পাঠচক্রের সদস্যের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর জীবনের মানব সেবা-সহ নানা প্রসঙ্গ বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন। পাঠচক্রের সদস্যা সায়ন্তিকা মণ্ডল স্বদেশ মন্ত্র পাঠ এবং সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে নেত্রকুম্ভের উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে গত ৫ জানুয়ারি ১০ একর জমির ওপর নেত্রকুম্ভের উদ্‌ঘাটন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল দেশবাসীর কাছে আহ্বান করেন যে, সমগ্র দেশবাসী কর্নিয়া দানের সংকল্প নিয়ে দৃষ্টিহীনতার সমস্যা সমাধানে নিজের ভূমিকা পালন করুন। ভারতের তুলনায় ছোটো দেশ শ্রীলঙ্কায় কর্নিয়া দানের হার অনেক বেশি, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতের অনুপাত অনেক কম। এর বৃদ্ধির প্রয়োজন। নেত্রকুম্ভের মাধ্যমে এই বার্তা দিতে চাই, আগামী ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে আমরা দেশ থেকে দৃষ্টিহীনতার সমস্যাকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলব। ড. কৃষ্ণগোপাল তীর্থরাজ প্রয়াগে গঙ্গার পবিত্র তটে আয়োজিত বিশাল নেত্র কুম্ভের উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক বিদ্বান দ্বারা স্বস্তিবচন পাঠ এবং ভক্তকবি সুরদাস ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তিনি মনে করান যে, এটিই প্রয়াগের সেই পবিত্র মাটি, যেখানে মহারাজা হর্ষবর্ধন নিজের সর্বস্ব দান করে দিতেন। মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্যের সীমা অসম থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নিজের পরনের কাপড়টাও দান করে বোনের কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে নিয়ে সেটি পরে বাড়ি ফিরে যেতেন।

হিন্দু সমাজের মধ্যে দান করার মানসিকতা কম নয়। অযোধ্যায় রামলালার মন্দির নির্মাণের সময় হিন্দু সমাজ ব্যাপকভাবে সহযোগী হয়ে ৩,৮০০ কোটি টাকা মন্দির নির্মাণের জন্য দান করে। পরে অনুরোধ করে দানকার্য বন্ধ করা হয়। ড. কৃষ্ণগোপাল বলেন, গত কুম্ভে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার জনকে চশমা দেওয়া হয়। বিশ্ব কীর্তিমানের প্রমাণপত্র আমরা পেয়েছি। হরিদ্বারের কুম্ভে ১২ টি স্থানে নেত্র কুম্ভের অয়োজন করা হয়েছিল। ৪০০ জন চক্ষু চিকিৎসক হরিদ্বারে সেবাকাজে অংশ নেন। এবার প্রয়াগরাজে নতুন কীর্তি স্থাপন করা হবে। ২৫০ টি সংস্থা একসঙ্গে নেত্রদান ও অস্ত্রোপচারে অংশ নিচ্ছেন। কেরালা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বে এক নতুন কীর্তি স্থাপন করবে।

'জীবনকালে রক্তদান, জীবনান্তে নেত্রদান' এই উদঘোষের মাধ্যমে তিনি বলেন যে, দেশে নেত্রদানে উৎসাহের জন্য ব্যাপক জনজাগরণের প্রয়োজন। এবারের নেত্রকুম্ভ এই ঘাটতি পূরণ করবে। নেত্রকুম্ভের মাধ্যমে ৬০ হাজার অস্ত্রোপচারের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। যে যে নগরে থাকবেন তাদের অস্ত্রোপচার সেখানেই হবে। তাদের কাছে শুধু সংবাদ পৌঁছানো প্রয়োজন। ড. কৃষ্ণগোপাল বলেন, আধ্যাত্মিকতা ভারতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট। বিশ্বের কাছে প্রভূত পরিমাণে জাগতিক সম্পদ থাকতে পারে, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। শান্তির পথ কেবল ভারতের কাছেই আছে, যার প্রয়োজন আজকে সারা বিশ্ব অনুভব করছে। অন্য পন্থের লোকেরা কেবল নিজেদের অনুগামীদেরই সুখী হওয়ার কথা বলে, সেখানে ভারত সকল মত-পন্থ মানুষের সুখের কথা চিন্তা করে। সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করাই ভারতের উদ্দেশ্য। এটাই ঈশ্বরীয় কাজ।

জুনা আখাড়ার মহামণ্ডলেশ্বর অবধেশানন্দ গিরি বলেন, চোখ ছাড়া প্রকৃতি ও পরমেশ্বর কাউকেই দেখা যায় না। এই জন্য নেত্রদানকে সর্বোচ্চ দান মনে করা হয়। অর্পণ, তর্পণ ও সমর্পণই সনাতন সংস্কৃতির বার্তা। ইসকনের আন্তর্জাতিক ট্রাস্টি তথা গোবর্ধন ইকো ভিলেজের নির্দেশক গৌরাঙ্গ প্রভু বলেন, নেত্রকুম্ভ সেবাভাবের প্রতীক। তিনিই পূজনীয় যিনি পরোপকারে রত। নেত্রকুম্ভে ভোজন প্রসাদ বিতরণের ভার ইসকন পালন করছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, ১২০ টি দেশে কার্যরত ইসকন এই নেত্রকুম্ভে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

উদ্‌ঘাটন সত্রে নওলজীর লেখা 'নেত্রকুম্ভ ও নেত্রদান' শীর্ষক পুস্তিকার উন্মোচন করা হয়। এবারের নেত্রকুম্ভে (মহাকুম্ভ ২০২৫) ৫০০ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ৫ লক্ষ মানুষের চক্ষু পরীক্ষা, ৩ লক্ষ নিঃশুল্ক চশমা বিতরণ এবং বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ৬০ হাজার মানুষের অস্ত্রোপচার করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা ৫০ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা হবে। ২০১৯ -এর প্রয়াগরাজে সম্পন্ন হওয়া নেত্রকুম্ভে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২১০টি চশমা বিতরণ করা হয়। ২ লক্ষ ২ হাজার ২০ জন মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। সক্ষমের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ গোবিন্দ রাজ অতিথিদের স্বাগত এবং আয়োজন সমিতির অধ্যক্ষ কবীন্দ্র প্রতাপ সিংহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সক্ষমের সংগঠন মন্ত্রী চন্দ্রশেখর নেত্রকুম্ভের আয়োজনের উদ্দেশ্যের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে মোতিলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজের উপাচার্য ডাঃ বৎসলা মিশ্র, প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ এসপি সিংহ-সহ দু'শোর বেশি চিকিৎসক এবং বিরাট সংখ্যায় অধ্যাপক ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের যুব সাংস্কৃতিক মহোৎসব

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে কলকাতা-স্থিত পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে গত ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য যুব সাংস্কৃতিক মহোৎসব। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি জগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা ছাত্রযুবদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, এবং তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মা সরস্বতী ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। এরপর একের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যেখানে গ্রামবাঙ্গলার সংগীত, লোকনৃত্য, নাটক এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-সহ নানান কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ, নাট্যকার, সাংবাদিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাস্কর সনাতন রুদ্র পাল এবং টোটো সমাজের প্রতিনিধি ধনীরাম টোটো। এছাড়াও ছিলেন সংগীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ঝুমুর শিল্পী মধুশ্রী হাতিয়াল, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. বীরেন্দ্র সোলাঙ্কি লোকগীতি শিল্পী তরণী মণ্ডল, তারিণী সেন মহন্ত, অধ্যাপক তন্ময় ভট্টাচার্য, ড. মোহন ঘোষ এবং পূর্বক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক অপাংশুশেখর শীল। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে যুবসমাজের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ও চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. বীরেন্দ্র সোলাঙ্কি বলেন, 'স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ আমাদের আজকের যুবসমাজের জন্য অমূল্য প্রেরণা। এই মহোৎসবের মাধ্যমে আমরা যুবকদের সৃজনশীলতাকে মঞ্চে তুলে ধরে তাঁদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাই।' পাঁচশোর বেশি ছাত্রযুবার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র বিতরণ

আরোগ্য ভারতী কলকাতা পূর্ব বিভাগের উদ্যোগে গত ১৫ জানুয়ারি যাত্রাগাছি আরআর সাইড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সোয়েটার বিতরণ করা হয়। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঙ্গলাল দেবনাথ-সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা পূর্ব বিভাগ প্রচারক ডাঃ পলাশ দলুই, আরোগ্য ভারতীর ডাঃ সুনন্দ দে, আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সহ সচিব দিলীপ সরকার, সহ সভাপতি জয়ন্ত সেন, শ্রীমতী শিখা চৌধুরী, শ্রীমতী সুইচা বনশল প্রমুখ। ডাঃ দলুই ও ডাঃ দে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে এবং শ্রীসেন আসন-প্রাণায়ামের উপকারিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সম্মেলন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ১১,১২ জানুয়ারি ক্রীড়া ভারতী ও সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সল্টলেকস্থিত পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (ইজেডসিসি) আয়োজিত হয় দু'দিন ব্যাপী ক্রীড়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১১ তারিখ বিকাল ৪টায় ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শিবনাথ মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজ চৌধুরী, অখিল ভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক মধুময় নাথ, এআইএফএফ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কল্যাণ চৌবে, প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়, পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, বিশ্বজিত পালিত এবং সক্ষমের ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, ডাঃ সাত্যকি দাস, অনিখ ব্যানার্জি-সহ সংগঠনের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কার্যকর্তারা। সম্মেলনে বিভিন্ন কলাকুশলী নাচ-গান, আসন, ব্যায়াম, ক্যারাটের পাশাপাশি আত্মরক্ষামূলক কলা প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাধ্যমে খেলার গুরুত্ব, বিশ্বের ময়দানে ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান-সহ শরীর সুস্থ্য রাখার কথা বক্তারা উল্লেখ করেন। পরদিন সকালে নিউটাউনস্থিত ডিএফ ময়দানে বিদ্যালয়স্তরের যুবক-যুবতীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২০টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে ১৬টি স্থান থেকে আসা যুবক-যুবতীরা আত্মরক্ষামূলক মহড়ার প্রদর্শন করে।

সক্ষম-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও আলোচনা সভা

গত ২৯ ডিসেম্বর যাদবপুরের সংস্কৃতি চক্র ভবনে সক্ষম-এর কলকাতা মহানগরের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, সক্ষমের প্রান্ত সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম-সহ অন্যান্য প্রান্ত ও জেলাস্তরের কার্যকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়।

মাথাভাঙ্গা শহরে প্রবীণ স্বয়ংসেবক জগদীশচন্দ্র ঘোষের স্মরণসভা

গত ৩০ ডিসেম্বর মাথাভাঙ্গা সঙ্ঘ কার্যালয় ভারত তীর্থে অনুষ্ঠিত হলো প্রবীণ জগদীশচন্দ্র ঘোষের স্মরণসভা। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য সাধন কুমার পাল এবং জেলা ও বিভাগস্তরের কার্যকর্তা ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শুভানুধ্যায়ী।

প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর পরিবার পরিজন ছাড়াও অনেকেই স্মৃতিচারণ করেন। শ্রীদত্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র ঘোষের দ্বারা মাথাভাঙ্গায় সঙ্ঘকাজের অবদান থেকে মহকুমা সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব নির্বাহন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং সামাজিকস্তরে ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। মাথাভাঙ্গায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালনের কথা বক্তব্যে উঠে আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার আশীর্বাদধন্যা নগেন্দ্রবালা দেবী

দীপক খাঁ

মা দীননাথ বসু ভাগনিকে নিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বহু লোকের সমাগম। দীননাথ বললেন, নগেন, ইনি পরমহংসদেব, প্রমাণ কর। বালিকা নগেন থতমত খেল। সে জানে না ইনি কে কিন্তু মার নির্দেশ মতো সে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে যায়। ধরে ফেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। বলেন শিশু নারায়ণ, মেয়েটি কে?

—ও আমার ভাগনি। গত বছর ওর মা মারা গেছে। বড়ো হতভাগী। মাঝে মাঝেই এখানে এসে থাকে।

তোমার ভাগনি সুলক্ষণা, ওর দেহে যোগিনীর লক্ষণ আছে, বলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। বালিকা পরবর্তীকালে বলেছিল, সেই একবার, একবার মাত্র মহাপুরুষকে দেখেছি, তাঁর চরণ ছোঁয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সেই দেবদেহের ছোঁয়া পেয়েছি, করুণমাখানো হাতখানি তিনি আমার মাথায় রেখেছিলেন।

নগেন্দ্রবালার তখন বয়স ছয় বা সাত হবে। বাবা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অবশ্যই বাবার অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছিল সে। তার নিজের ভাষায়, ছোটোবেলা থেকেই আমার নিজের রীতিতেই আমি চলতাম। আমার সমবয়সিরা নানারকম ব্রত করত। আমি তো কোনো ব্রত করিনি, কারণ কিছু কামনা করে ব্রত পালন করতে আমার মন চাইত না। কিন্তু ছেলেবেলায় শিবপূজা করতাম। বাবার খাবার কষ্ট দেখে নিজে রাঁধতে শিখেছিলাম। বড়ো বয়সে আমার রান্নার সকলেই প্রশংসা করে। আমার বড়ো মামিমা জনৈকা ইংরেজ মহিলার কাছে সূচিকর্ম শিখতেন। পরে সেই মহিলা ইংল্যান্ড চলে যান। সূচিশিল্প অসম্পূর্ণ ছিল। আমি বড়ো হতে সেগুলো দেখে দেখে সম্পূর্ণ করেছিলাম। মামাবাড়ির অনেকেই বলেছিল— নগেন, একাজ করলি কী করে? উত্তর দিতে পারিনি।

বয়স তখন তেরো। বাবা মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন— লোকমুখে শুনলাম হবু বর যুবক ডাক্তার কিন্তু বিয়ে দ্বিতীয় পক্ষে। বরের নাম ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ, নিবাস বাগবাজার, ৫২নং রামকান্ত বোস লেন। নববধূ দেখলাম, শ্বশুরবাড়ির সবকিছু বাপের বাড়ি থেকে ভিন্ন। ওখানে প্রাচুর্য আর এখানে অসচ্ছলতা। সেখানে ঝকঝকে অট্টালিকা, এখানে পুরানো ঘর— ভাঙাচোরা, অরক্ষিত অবস্থা। শাশুড়ি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

নগেনের বাড়ির কাছেই ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি। নগেনই এসেছিল এগিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা নিয়ে। নিবেদিতা একজন বিদেশিনী। ইংরেজি বলতে পারত না নগেন। কিন্তু সবকিছুই বুঝতে পারত— কী আশ্চর্য! নিবেদিতা অন্যান্য ইংরেজ মহিলাদের তাঁর বাড়িটি দেখিয়ে বলত— 'এটি একটি আদর্শ হিন্দু গৃহস্থবাটী।'

নগেন্দ্রবালা ছোটোবেলায় একটি কবিতা পড়েছিল— সেটিই তাঁর জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। 'রন্ধনে দ্রৌপদীসম, অন্নপূর্ণা দানে, মেনকা যশোদাময় সন্তান পালনে, গৌরীসম গৌরবিনী পতিব্রতা মাঝে, অকলঙ্ক অরুন্ধতী গৃহিণীর কাজে। সবারে সন্তোষ করি, করি যেন ঘর, এই বর দান মোরে কর মহেশ্বর।' নগেন্দ্রবালার চেতনা ছিল সৃষ্টিমুখী।

চাঁপাকলার সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সুমিষ্ট পাউরুটি তৈরি করেছিল। সুন্দর আচার তৈরি করেছিল সে, নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলেছিল, এটাকে কর্মাশিয়াল বেসিনে তৈরি কর— তা থেকে আমার স্কুলের কিছু আয় হয়। এটা যেকোনো কারণেই রূপায়ণ হয়নি কিন্তু বহু মেয়ে এই আচার বিক্রি করে তাদের সংসারের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁর স্কুলের মেয়েদের সূচিশিল্প

With Best Compliments from : -

INDER NAHATA

Rang Rez Sarees (P) Ltd.

Manufacturer of Sarees & Kurti

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Near Park Street Police Station)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 94330-15473

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),

1st Floor, Suit # 01

Kolkata - 700 006

(Near Calcutta Medicos)

An ISO 9001:2008 Company

Phone : +91 33 40726528, 40036528 E-mail : ashok@acclogistics.in

URL : www.acclogistics.in

শেখাতেন আর নগেন নিবেদিতাকে নানাভাবে সাহায্য করত। বিদেশি নমুনা দেখিয়ে নগেনকে বলেছিলেন রেশমের একটি চিঠি রাখা ব্যাগ করে দিতে। নগেন সেটি করে দিয়েছিল। নিবেদিতা যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে শশিভূষণ ঘোষকে বলেছিলেন— 'আপনার স্ত্রী লক্ষে একটি, ইনি কী না করতে পারেন, আমি জানি না। তিনি সত্য সত্যই নারীরত্ন।'

১৯০৩ সালে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে কিছু বালককে দেশভ্রমণে পাঠান অবশ্যই তাঁর স্কুলের। সেই বালকের মধ্যে ছিল রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শশীভূষণ তনয় বসন্ত। এই উদ্যোগে সিস্টারকে অর্থ সাহায্যও করেছিল নগেন্দ্রবালা।

নগেন যেমন সুগৃহিণী তেমনি ছিলেন দক্ষ রাঁধুনি। স্বামী বিবেকানন্দ নগেন্দ্রবালার হাতে মাংস খেতে ভালোবাসতেন। বলরাম বসুর গৃহে এলেই তিনি শশীভূষণকে বলতেন, ডাক্তার, বউঠানকে বলো আজ রাতে মাংস খাব। পাশ্চাত্য বিজয় করে স্বামীজী যেদিন বাগবাজারে সংবর্ধনা নিয়েছিলেন, সেই রাত্রিতে শশীভূষণের বাড়িতে মাংসভাত খেয়েছিলেন। এতই উৎকৃষ্ট রান্না হয়েছিল স্বামীজী মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'বউঠান যদি রান্নাকে জীবিকা হিসেবে নিত, নিশ্চিত পাঁচশো টাকা তার বেতন হতো।'
গৌরীমার সঙ্গে নগেন যখন বলরাম বসুর বাড়িতে হাজির হলো, শ্রীমা তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শ্রীমা তাদের দেখে আনন্দিত হলেন এবং গৌরীমাকে বললেন, এ আমাদের ডাঃ শশীর বউ। খুব লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। হেন কাজ নেই যে ও জানে না। মা খুবই ক্লান্ত ছিলেন, ফলে মা বলেন, আবার এসো একদিন। একদিন নিজের হাতে পাঁপড় তৈরি করে মায়ের কাছে আসে। মা সারদা তা দেখে খুশি হয়ে বলেন, খুব ভালো হয়েছে, মা। কেবল মনে রেখো তুমি যা করছ তা ঠাকুরের কাজ করছ এই চিন্তাই করো, তাহলে মনে কোনো কষ্ট পাবে না।

একদিন নগেনের বাসনা হলো মা যদি কৃপা করে একদিন তার বাড়িতে পায়ের ধুলা দেন! কী আশ্চর্য সুযোগও এসে গেল। স্বামীজী যেবার বিদেশ থেকে ফিরে ঠাকুরের কয়েকটি পোর্সিলিনের পট এনেছিলেন। তার একটি তিনি শশীভূষণকে দিয়ে বলেছিলেন, ডাক্তার, এটা ঘরে প্রতিষ্ঠা করিস!

শশীভূষণের ইচ্ছা মা নিজ হাতে ঠাকুরকে তাঁর ঘরে প্রতিষ্ঠা করুন। দিন স্থির হয়ে গেল। ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠাকালে গৌরীমা তাঁর ঝোলা থেকে শ্রীমার বাঁধানো ফোটো বের করে বললেন— মা দুজনকেই প্রতিষ্ঠা করুন। একাএকা ঠিক নয়। শ্রীমা মৃদু হাসলেন। তারপর নিজ হাতে নগেনের ঘরে ঠাকুর ও নিজের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করলেন।

শশীভূষণ গৌরীমাকে একদিন বলেন, দেখুন মা, নগেনের সব ভালো কিন্তু মায়ের কাছে মন্ত্র নেওয়ার কোনো আগ্রহ দেখছি না। গৌরীমা'রও তাই ইচ্ছে ফাঁকা পেয়ে বললেন, বউমা তোমার এত গুণ, এত ভক্তি, তুমি মা ঠাকরুণের কাছে দীক্ষা নাও।

নগেন উত্তরে বলল— দীক্ষা নিলে কী আর বেশি হবে মা? গুরুকে যদি সাধারণ মানুষের উপরে ভাবতে না পারি তবে শুধু শুধু একটা মন্ত্র নিয়ে কী হবে? বলুন, আপনি?

গৌরীমা বলেন, মা ঠাকরুণের মন্ত্রের কত শক্তি তুমি তো জান না। মন্ত্র জপ করলে তোমার মনের সব সন্দ, সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।

পরেরদিন সকালেই গৌরীমা নগেনের ঘরে হাজির। কিছু কথাবার্তার পর নগেনকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। স্নান সেরে ফেরার পথে বললেন বউমা, মা ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করে যাই। উভয়ই বলরাম বসুর গৃহে হাজির, যখন মা পূজায় বসছেন। সেদিনটা নগেনের কাছে সবই অভিনব লাগল। সে মুগ্ধ হয়ে মায়ের পূজা দেখতে লাগল। মা পূজা সেরে উঠলে গৌরীমা তাঁকে কী যেন ইশারা করলেন। মা, তৎক্ষণাৎ নগেনকে নিজের কাছে ডাকলেন। নগেন মায়ের কাছে হাজির হলে মা তাকে মহামন্ত্র দান করলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর মাকে প্রণাম নিবেদন করলে মা বললেন— মা, তুমি সংসারে থাকবে বটে, তবে খড়কুটা নারকেলের মতো থাকবে, আসক্তি হবে না। পরে গৌরীমাকে বলেন— বউমা সংসারে থাকলেও 'যোগিনী' হবে।

দীক্ষা গ্রহণের পর— বাড়ির চাকর চুরি করছে, সকলেই তাকে তাড়াতে চায়। কিন্তু নগেন বলে না, ওর সমস্যাটা শুনি, দেখি ওর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে কিনা। নগেন মাতৃস্নেহে বোঝাল। চাকরও ধীরে ধীরে এত বিশ্বস্ত হয়ে গেল যে, জীবনের শেষদিন অবধি সে ওই ঘোষবাড়িতেই কাটিয়েছিল। নগেনের স্বামী ডাঃ শশীভূষণ এক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে স্বামীর চিন্তা দূর করতে নগেন তাঁর সমস্ত অলংকার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে ঋণভার মুক্ত করেছিল। একবার তাঁর স্বামী তাঁর নামে জীবনবিমা কোম্পানিতে কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখার পরিকল্পনা করেন। নগেন স্বামীকে বলে, তুমি ও কাজ করো না। আমার বৈধব্য হবে না। কাজেই ও টাকা গচ্ছিত রাখাটা অপচয় হবে। তাঁর মেয়েরা তাকে অলংকার পরাতে চাইলে নগেন বলে— তোরাই আমার অলংকার। কৃত্রিম অলংকারে কী হবে? একদিন ডাক্তার গৌরীমাকে বলেন, গৌরীমা, আপনি যে কী যাদু করে দিলেন, এখন দেখছি তিনি আমাকে পিছনে ফেলে দিনকে দিন এগিয়ে চলেছেন।

নগেন যে সমস্ত কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিল সেগুলো চালাতে লাগল সমান গতিতেই। বয়স বেড়েছে, কোমরের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ডাক্তার ওষুধ নিয়ে এলেন। নগেন তা খেল না, বলল— বস্তির বহু প্রসূতি ওষুধ অভাবে মারা যাচ্ছে, তাদের চিকিৎসায় ওই ওষুধের খরচাটা দাও— ভালো হবে। মায়ের কৃপায় আমি ঠিক সুস্থ হয়ে যাব। স্বামী জোর করেন না, জানেন যে তাতে কাজ হবে না। ছেলে, জামাই সবার কাছেই নগেনের একটাই কথা— মন ও মুখ আলাদা হলে সে জন্তু, সে মানুষ থাকে না। □

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

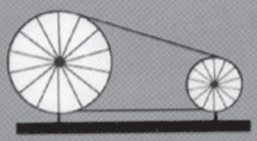

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ভারতের সংবিধান ভারতীয় গণতন্ত্রের ধর্মগ্রন্থ

ভারতের সংবিধানের মূল ভাবনা বা মনোভূমিকা হবে সততার প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ ভারতীয় জীবনশৈলী। যার মূল ভিত্তি হবে ভারতীয় জীবন-সংস্কৃতি যেখানে কোনো বিদেশি ভাবধারার প্রভাব থাকবে না।

দুর্গাপদ ঘোষ

সুভাষচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের সংবিধান হবে পুরোপুরিভাবে বিদেশি প্রভাবমুক্ত। ভারতীয় সংবিধান হবে ভারতের নিজস্ব সংবিধান— Law of the Land। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যে সংবিধান আমরা লাভ করেছি সেটা বস্তুত ওয়েস্টমিনিস্টার প্যাটার্নের। ব্রিটিশ সংবিধানের প্রায় একখানা ফোটো কপির মতো। স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৯ বছর আগে নেতাজী ঘোষণা করেছিলেন, কোনো বিদেশির রচনা করা সংবিধান ভারতবর্ষ মেনে নেবে না। ভারতের সংবিধান হবে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এবং সেই দাবি যদি না মানা হয় তাহলে ফের অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা

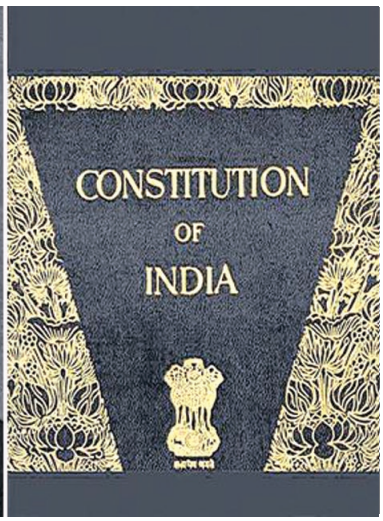

হবে। দিনটা ছিল ১৯৩৮ সালের ২০ নভেম্বর। তার কিছুদিন আগেই ড. পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি হন তিনি। সেই সূত্রে সেদিন লক্ষ্ণৌয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য, বিশেষ করে সেখানকার বাঙ্গালিরা এক সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় বলাবাহুল্য ভারতীয় কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি বুক চিতিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'India will not have any constitution framed by foreigners. The country will place demand for its own constitution to the British Government. If the demand are rejected, another mass civil disobedience movement would be started.' শেষপর্যন্ত ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি মুখ্যত কংগ্রেস নেতৃবর্গের দ্বারা প্রণীত সংবিধান যখন কার্যকর করা হলো তখন আর ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি পেশ করতে হয়নি ঠিকই কিন্তু এমন একখানা সংবিধান ভারতবাসী পেল যা ভারতীয় নেতাদের হাতে তৈরি হলেও কার্যত তার ছত্রে ছত্রে প্রখ্যাত বিদেশি সংবিধান রচয়িতা স্যার আইভর জেনিংস-এর চিন্তাভাবনার ছাপ রয়েছে। ভারতে এখনো বলবৎ রয়েছে ১৮৩৫ সালের কিছু ব্রিটিশ আইন। ১৯০৮ সালের ধর্মস্থান সংক্রান্ত আইন বলবৎ রয়েছে। জেনিংস সাহেব যথারীতি ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের সংবিধানের মতো সিলোন (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) ও নেপালের সংবিধানের খসড়াও রচনা করেছিলেন। কিন্তু উল্লেখিত দুই দেশ ব্রিটিশ ধাঁচের সংবিধানের সবটা গ্রহণ করেনি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জায়গাটুকু ছাড়া বাকিটা নিজেদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই করে বানিয়ে নিয়েছে।

স্বাধীনতা নামের বিষয়টাকে কেবল 'স্ব' অর্থাৎ নিজের অধীনতা ভাবলে তার যে অর্থ দাঁড়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তা থেকে নিঃসন্দেহে কিছু পৃথকভাবে স্বাধীনতার কল্পনা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক কিংবা স্ব-স্বার্থভাবনা অতিক্রম না করলে কোনো সংবিধান তার দেশের এবং দেশবাসীর সকলের জন্য, সাধারণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্বদেশীয় সংস্কৃতির আদর্শভিত্তিক সদ্ভাবনা সম্পৃক্ত না হলে বা না মিললে সেদেশীয় সমাজের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের মানুষের সত্যিকারের অগ্রগতি ও উন্নয়ন অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে এখন আর রাজতন্ত্র নেই। রাজা নেই, সুতরাং প্রজাও নেই। তবুও ২৬ জানুয়ারি দিনটা 'প্রজাতন্ত্র' দিবস অভিধায় ভূষিত হয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে সাধারণতন্ত্র দিবস।

ঔপনিবেশিক ভারত ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের অন্তিম এবং ১৫ আগস্টের

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

With Best Compliments

from-

Sindhuja Indocorp Pvt. Ltd.

5, Clive Row, 2nd Floor
Room No. 56
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works

GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North), PIN-700 136

Office :

3, Synagogue Street, Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

সুচনালগ্নে যখন স্ব-শাসনের অধিকার লাভ করল। তখন তার ত্রিখণ্ডিত রূপটার কথা ভাবলে সত্যিকারের স্বাধীনতা দিবস বলা ঠিক হবে না। কিন্তু সংস্কৃতিগত দিকের গভীরে প্রবেশ করলে বলতে দ্বিধা করার কারণ নেই, যে স্বাধীন ভারত আমাদের স্বাতন্ত্র্যবীরেরা চেয়েছিলেন তা নেহরুর 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর থেকে অনেকটাই ভিন্ন। নেহরুর নেতৃত্বে ১৯২৯ সালের শেষ প্রান্তে উল্লেখিত 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর শপথ-সূত্রে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারিকে বলা হয়েছিল 'স্বাধীনতা দিবস'। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত যখন নিজস্ব শাসন ক্ষমতা লাভ করল এবং ভাগ্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল ঘটনাচক্রে দিনটা দাঁড়াল ১৫ আগস্ট।

তার ফলে ২৬ জানুয়ারির অভিধাও বদলে গেল। তার আড়াই বছর পরে সংবিধান প্রস্তুত হবার পর তা কার্যকর করার জন্য বেছে নেওয়া হলো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর 'শপথ-সূত্র'-এর সেই ২৬ জানুয়ারি তারিখকে। একই সময়ে ভারতভূমির অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য যে দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেই দুই খণ্ডও ব্রিটিশ শাসনের কবলমুক্ত হয়ে এক ভিন্ন পরিচিতি পেল 'পাকিস্তান' (পূর্ব ও পশ্চিম) নামে। তাদের স্বাধীনতা দিবস নির্ধারিত হলো ১৪ আগস্ট। কিন্তু ত্রিখণ্ডিত ভারতের কোনো অংশেই অখণ্ড ভারতের পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও আদর্শের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি সম্পন্ন মততান্ত্রিক স্বতন্ত্রতা না মেলার কারণে ভারত যেমন নেতাজী সুভাষ, বীর সাভারকরদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাঙ্ক্ষিত ভারত হলো না, অন্যদিকে জিন্নার 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর বিভীষিকা বলে ভারতের অঙ্গ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাকিস্তানও না গণতন্ত্র, না সাধারণতন্ত্র কোনোটাই হতে পারল না। মূলত তখন থেকেই ভারত তার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী 'ভারতবর্ষ' নামের গুরুত্ব হারিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ হলো 'ইন্ডিয়া' নামে। সেটুকু গুরুত্ব বজায় রইল তা— 'that is Bharat'। আর আমরা ভারতবাসীরা হয়ে গেলাম 'We the people of India'।

তবে ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত-এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকটা হলো এটাই যে, এদেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে সাংবিধানকভাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে পৌঁছানোর স্বপ্নটা থেকে গেল। সংবিধান বলবৎ হবার পরের বছরই এরকম জনবহুল ও বহুত্ববাদী দেশের প্রতি জায়গায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার মাধ্যমে সেই তন্ত্রে উপনীত হবার ছাপ পরিলক্ষিত হলো। তাতে এটুকু আশা করা গিয়েছিল, যে সংবিধান পাওয়া গেছে যেকোনো পরিস্থিতিতে এদেশের শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের নেতারা যেকোনো মূল্যে তার মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে সংসদের নিম্নকক্ষের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী লাল রঙের মোড়কের ওপর constitution of India' শব্দগুলো ছাপিয়ে সম্পূর্ণ সাদা কাগজের বান্ডিলকে 'ভারতীয় সংবিধান' হিসেবে উঁচিয়ে ধরেন। তিনি যেভাবে তাঁর নিজের প্রমাতামহের অংশগ্রহণেও গৃহীত সংবিধানের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছেন তার নিন্দা করার ভাষা নেই। আরও লজ্জাজনক ঘটনা হলো, ইন্ডিয়া নামে এক রাজনৈতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর নেতারা, যাঁদের প্রায় সকলেই আদতে রাহুলের দল কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধী তাঁরাও এই ঘটনায় রাহুলকে প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রায়িত নাটক 'হীরক রাজার দেশে'-র মোসাহেবদের মতো তা-বটে, তা-ঠিক বলে সমর্থন করে বাহবা দিয়েছেন। কেবল এই একটা ঘটনা নয়। পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে স্বাধীনতার প্রথম দশক থেকেই নানা ধরনের সংকটের পূর্বলক্ষণগুলো দেখা দিচ্ছিল। গত ৭৫ বছরে সেগুলো ডালপালা মেলে অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

প্রথমে দুর্গাবাঈ দেশমুখ, রাজকুমারী অমৃতা কাউর, হংসাজির মেহতা এবং বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত-সহ মোট ১৫ জন মহিলা এবং ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত নেহরু, ড. বল্লভভাই প্যাটেল ও ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর-সহ ২৯৩ জন অর্থাৎ মোট ৩০৮ জনের গণপরিষদ তৈরি হয়। পরে ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত হয় মোট ২৯৯ জনের সংবিধান পরিষদ। অবশ্য তাতে প্রথমে তিনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের পূর্ববঙ্গ থেকে মনোনীতি একজন সদস্য। কিন্তু দেশ ভাগের ফলে তাঁর পূর্ববঙ্গের আসনটি হাতছাড়া হয়ে যায়। অতপর সর্দার প্যাটেলের উদ্যোগে কংগ্রেসের এক সদস্য নিজের আসন ছেড়ে দিলে ড. আম্বেদকর বম্বে থেকে নির্বাচিত হন। সংবিধান পরিষদ ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্ট থেকে কাজ শুরু করে। যদিও তা গঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ৮ ডিসেম্বর কিন্তু স্বাধীনতা এবং সেইসঙ্গে দেশভাগের প্রাক্কালে জিন্নার 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান'-এর ডাকে কলকাতা ও নোয়াখালি-সহ বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের কারণে পরিষদ তেমনভাবে কাজ শুরু করতে পারছিল না। স্বাধীনতা পাওয়ার ১৫ দিনের দিন থেকে প্রায় আড়াই বছর ধরে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সংবিধানের প্রথম অনুরূপ যে সংবিধান প্রণীত হলো তা ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের ব্রিটিশ সংবিধানও বেশ বড়ো তথা দীর্ঘ হলেও এখনো পর্যন্ত তা অলিখিত।

প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ তথা আইন বিশারদ ফলি নরিম্যান ২০০২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, '...it was too 'long,. too detailed, too rigid'— অতি দীর্ঘ, অতি বিস্তারিত, অত্যন্ত অনমনীয়। কিন্তু ঘটনা হলো, 'অতি বিস্তারিত' হওয়া সত্ত্বেও এদেশের প্রবহমান রীতিনীতি তথা সংস্কৃতির সঙ্গে এত অসামঞ্জস্য থেকে গেছে যে মাত্র ৭৪-৭৫ বছরের মধ্যে ১২৭ বার সংশোধনের প্রস্তাব এসেছে। 'অতি অনমনীয়' হওয়া সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করে বলপূর্বক ৪২তম সংশোধন ছাড়া আরও ১০৫ বার সংশোধন করতে হয়েছে। সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে যিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন সেই নেহরুর শাসনকালে ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ মাত্র সাড়ে১২ বছরের মধ্যে সংশোধন করতে হয়েছে ১৭ বার। কেন এমনটা ঘটেছে এবং ঘটছে তার একটা ব্যাখ্যা মিলতে পারে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এইচ আর খান্নার একটা লেখা থেকে।

তাঁর মতে কোনো সংবিধান কেবলমাত্র কিছু কাগজের পাতা নয়, তাহলো জীবনশৈলী

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

With Best Wishes-

UMAYA

Dry-Fruits & Spices
Umaya.contact@gmail.com
M.: 9831126557

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial
Private Limited

M. E. M. INDUSTRIES
AN ISO 9001 : 2015 Company
e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Mob. : 9830120020

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.

বা জীবনযাত্রার পথ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জীবন সংস্কৃতি— 'A constitution is not a Parchment of Papers; it is a way of life'। কাদের জীবনশৈলী? যে দেশের সংবিধান সেই দেশের সর্বসাধরণের। যে সমস্ত প্রচলিত পদ্ধতি বা নিয়মের গণ্ডিবদ্ধে তা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলো সেদেশের সাধারণতন্ত্র। সুতরাং ভারতের সংবিধানের নিয়মতন্ত্রগুলো হওয়া উচিত ছিল ভারতীয় পরম্পরাগত জীবনশৈলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু বর্তমান ভারতের এই সংবিধান প্রণয়নের সময় না রামায়ণের কালের আইনগ্রন্থ মনু সংহিতা, না মৌর্য চন্দ্রগুপ্তর সময়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কোনোটাকেই ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয়নি। তবে যে সংবিধান প্রাথমিকভাবে যেমনই হোক না কেন, আপামর দেশবাসী চাইলে তার যেকোনো ধারা তো বটেই এমনকী সম্পূর্ণ সংবিধানকেই বদলে ফেলা যেতে পারে। চিলি, টিউনিশিয়া, হাইতি, আর্মেনিয়া, কাজাকস্তান, বারবা ডোজ, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ তাদের প্রাথমিক সংবিধান আমূল বদলে ফেলেছে, কোনো কোনো দেশে ২০২২ সাল থেকে তার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তবে পাশাপাশি এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, যে সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল রয়েছে ততক্ষণ তাকে কোনোভাবেই উপহাস, অবজ্ঞা কিংবা অসম্মান করা যায় না। আলোচনা সমালোচনা হতেই পারে কিন্তু অগ্রাহ্য করা যায় না। 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে গলাবাজি করলেও সেই আজাদি বা স্বাধীনতাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি সংবিধানকেও অমান্য করা যায় না। কেননা তাহলো গণতন্ত্রের মন্দিরের ধর্মগ্রন্থ।

সংবিধান হলো আইনের মাতৃগর্ভ। গর্ভসঞ্চারের গোড়াতেই যদি কোনো ত্রুটি ঘটে তাহলে অপাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব হতে পারে। সেজন্য চিকিৎসকেরা শুরুতেই সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। সংবিধান প্রণয়নের শুরুতেও তেমনি সতর্ক, সাবধান ও দূরদৃষ্টি রাখা জরুরি। নাহলে অবাঞ্ছিত আইন প্রণীত হতে পারে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে আইনেরও যেন বিবেক থাকে। তা যেন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। কোনো আইন যেন অদূরদর্শী ও বিবেকবর্জিত না হতে পারে। কেবলমাত্র 'স্ব'-কেন্দ্রিক স্বাধিকার, বিশেষ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা কারও জন্যই নিরঙ্কুশ হতে পারে না।

নিজের নিজের ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত রয়েছে বলে কেউ যাতে অন্য ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে না পারে সংবিধানে ধর্মাচরণের অধিকার প্রদানের সময় বিষয়টিকে সুচিন্তিতভাবে মাথায় রাখতে হয়। বিশেষ করে এরকম সংবেদনশীল বিষয়ে অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সুদূরদৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি। গভীরভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে সাংবিধানিক অধিকার বলে কেউ যেন ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে কোনোভাবে কলুষিত না করতে পারে। বাক্‌স্বাধীনতার প্রাবধান রাখা হয়েছে বলে কেউ যাতে কোনো মহানপুরুষ কিংবা 'ভারত তেরে টুকরে হেঙ্গে' বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান তুলতে না পারে— ভবিষ্যতে এই ধরনের সঙ্কট সৃষ্টির অবকাশ যাতে না থাকে শুরুতেই সে বিষয়ে সতর্ক ও দূরদৃষ্টি রাখা দরকার।

> **"ভারতের সংবিধান অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও পন্থনিরপেক্ষ। জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ ঢোকানোর আগেও তা ছিল। এ জন্যই ২৬ জানুয়ারি দিনটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।"**

সংবিধানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সংসদ ভবন। ভারতের সেই সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলার নাটের গুরু আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলার সাহস করছে তারা সে সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে? সংবিধানে প্রদত্ত মত প্রকাশের অবাধ অধিকার বা স্বাধীনতা থেকে নয় কি? নাহলে তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান তথা আইন লঙ্ঘন করার দায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না কেন? সম্প্রতি পরিস্থিতির এতটাই অবনমন ঘটেছে যে কিছু জায়গায় পুরুষরা বোরখা পরে মুসলমান মহিলা সেজে জালভোট দেওয়ার অভিযোগ উঠলেও ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকারের বর্মের কারণে কিছু করা যাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন তো কোন ছার, এ ব্যাপারে খোদ নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত অসহায় বোধ করছে।

সাংবিধানিক অধিকারের বলে এখন আবার কেউ কেউ জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলিজা মুফতির মতো হিন্দুত্বকে রোগ বলে মন্তব্য করার দুঃসাহস করছেন। আরও এক কদম এগিয়ে কেউ কেউ হিন্দুদের 'ডেঙ্গু-ক্যান্সার 'রোগ' বলে মন্তব্য করে সমূলে উপড়ে ফেলার ধৃষ্টতা দেখাতেও পিছপা হচ্ছে না। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধি মারান কয়েক মাস আগে 'সনাতন উন্মুলন'-এর ডাক দিয়ে প্রকাশ্য সভা করেছেন। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা দূরের কথা, সাধারণ দুঃখ প্রকাশ করতেও রাজি হননি। শাসন ক্ষমতার মদগর্বী একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যিনি সংবিধানের শপথ নিয়ে সে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন তিনি এদেশের সুপ্রাচীন ও সুমহান সনাতন সংস্কৃতি যার মূল মন্ত্র হলো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'সর্বেপি সুখিনঃ সন্তু...' সেই হিন্দুত্বকে সমূলে বিনাশ করার জন্য জনসমাবেশ করলেও অনেকে স্বঘোষিত নেতা ও বুদ্ধিজীবীর মত তথা অভিব্যক্তি প্রকাশের অধিকার বলে সমর্থন করে সাফাই গাইবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের সঙ্কট তৈরি হতে পারে এটা অনুমান করে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা যদি শুরুতেই যথাযথ নির্দেশিকার ব্যবস্থা রাখতেন তাহলে আজ

এদেশের ৭৮.৮ শতাংশ হিন্দুকে এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতো না। কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের সংবিধান প্রণয়নের সময় এর প্রণেতারা বহুত্ববাদী ভারতীয় জীবনশৈলী প্রবাহিত ভারতের ক্ষেত্রে বিদেশি সংবিধানের প্রভাবমুক্ত হতে পরেননি। তা যদি হতো তাহলে মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে এদেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা হয়তো হতো না।

আগেই বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণহীন অধিকার কিংবা অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা কাম্য হতে পারে না। কারণ তা হলো বলপ্রয়োগ নীতির সমতুল। ভারতের সংবিধান অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও পন্থনিরপেক্ষ। জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ ঢোকানোর আগেও তা ছিল। এ জন্যই ২৬ জানুয়ারি দিনটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। গণতন্ত্রে বলপ্রয়োগতন্ত্র কিংবা জিদতন্ত্র চলে না। সেটা একনায়কতন্ত্রের হাতিয়ার হতে পারে। গণতন্ত্র জেহাদি মানসিকতার দ্যোতক কিংবা বহিঃপ্রকাশ নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে স্বাধীনতা বা স্বাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আইনের অঙ্কুশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

গণতন্ত্রে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, সাধারণ-প্রভাবশালী, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মালিক-শ্রমিক, সবল-দুর্বল, নেতা-ভোটার ইত্যাদি সবার ক্ষেত্রেই আইন সমান এবং সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এদেশে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই একাধিক ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। কেবল ধর্মীয় অধিকার এবং সংরক্ষণের বেলাতেই নয়, এমনকী শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধান প্রথম থেকেই ভারতের সমস্ত স্থানে বা সমস্ত রাজ্যে সমানভাবে বলবৎ ছিল না। তাও দু'-পাঁচ বছর নয়। প্রায় পৌনে একশো বছর ধরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রচেষ্টায় ২০১৯ সালের ৯ আগস্ট ভারতীয় সংসদে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের সংবিধান পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর হতো না। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের অক্টোবরে সর্বপ্রথম এই সংবিধানের শপথ নিয়ে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ওমর আবদুল্লা। গত বছর ২৬ নভেম্বর জম্মু-কাশ্মীরে প্রথম 'সংবিধান দিবস' পালিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর জম্মু-কাশ্মীর সরকারিভাবে ভারতভুক্ত হয়ে হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে বলবৎ হওয়া ভারতের সংবিধান দীর্ঘদিন যাবৎ কাশ্মীরে প্রযোজ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে Indian constitution was universal in form but partial in subslance--- আংশিক ভারতের জন্য। এখনো এদেশে 'এক জাতি এক আইন' বলবৎ যা বোঝায় তা নেই। ফৌজদারি আইন সমান বা সবার জন্য এক হলেও সবার জন্য এক দেওয়ানি বিধি— Commomn civil code বা Universal civil code লাগু করা হয়নি। লাগু হয়েছে কেবল 'হিন্দু কোড বিল'। যখনই এক দেওয়ানি আইন-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে তখনই যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে এখনও সেই একই অবস্থা হচ্ছে।

সংরক্ষণ বা বিশেষ ব্যবস্থার অধিকার এমনই একটা সুবিধাবাদ যে তা কোনো এক পক্ষকে দেওয়া হলে কালক্রমে অন্যরাও তার দাবি তুলে এগিয়ে আসতে পারে। এক রাজ্যকে 'বিশেষ রাজ্য'-এর মর্যাদা দিয়ে সুবিধা দেওয়া হলে আজ হোক, কাল হোক অন্য রাজ্যও সে দাবি করতে পারে এবং দাবি তোলা আন্দোলন সব সময় যে শান্তিপূর্ণ হবে বা থাকবে তারও নিশ্চয়তা নেই। সমাজের কোনো এক অংশকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হলে অন্য অংশও নিজেদের বঞ্চিত মনে করে প্রতিবাদে কিংবা একই দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এখন অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই। কেউ চাইছে মুসলমান সংরক্ষণ, মনোজ জারাঙ্গে পাটিলের মতো কেউ চাইছে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা। সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে মণিপুরে খ্রিস্ট মতবাদে ধর্মান্তরিত কুকি সম্প্রদায় এবং মুখ্যত বৈষ্ণব মতবাদী হিন্দুদের মধ্যে বিগত অনেক বছর ধরে কী ধরনের হানাহানির ঘটনা ঘটে চলেছে এবং রাজ্যের সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধেও তা কী ধরনের হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে তা কারও অজানা নয়। সংবিধানে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক দেশের সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য নয়। ঘাগু উকিলদের ভাষার কারিকুরিতে আইনি কূটকচালির মাধ্যমে সেসব শব্দের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। মূলত ইংরেজিতে প্রণীত ভারতের সংবিধানে অনেক ল্যাটিন, ইংরেজিও বসেছে যা এমনিতেই সহজবোধ্য নয়। সংবিধান রচনাকালে গণতন্ত্রের পরিধির আধারে উদারতার বিষয়টা যতই মহান হোক না কেন, ভবিষ্যতে তা নিয়ে যাতে বিকট ধরনের জটিলতা সৃষ্টি না হতে পারে সেদিকেও দূরদৃষ্টি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা দরকার, মুক্তকচ্ছ উদারতার পরিণাম সুখকর নাও হতে পারে। ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপের সংবিধানের কারণে আজ খোদ ব্রিটেনকেও নানা সঙ্কটের মুখে পড়তে হচ্ছে। এখন থেকে প্রায় দু' দশক আসে ব্রিটেনের সংসদের মধ্যেই পৃথক মুসলমান সংসদের দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

ভারতের সংবিধান গৃহীত হবার দিন সংবিধান পরিষদে শেষ ভাষণে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, India does not need anything more than a group of honest people who will keep the country's interest above their own. যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রথম ও সর্বোপরি হলো দেশ বা জাতি।

অর্থাৎ ভারতের সংবিধানের মূল ভাবনা বা মনোভূমিকা হবে সততার প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ ভারতীয় জীবনশৈলী। যার মূল ভিত্তি হবে ভারতীয় জীবন-সংস্কৃতি যেখানে কোনো বিদেশি ভাবধারার প্রভাব থাকবে না। এ যেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সংবিধান লাগু হবার প্রায় শুরু থেকেই নানা বৈপরীত্য ও সমস্যা শুরু হয়েছে। কেন এমনটা হলো সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। মনে হয় এই কারণে যে, গণপরিষদ, সংবিধান সভা তথা সংবিধান পরিষদে যিনি যে বক্তব্য তুলে ধরে থাকুন, ওয়েস্ট মিনিস্টার ধাঁচের সংবিধানের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। নেতাজীর মতো নেতারা এদেশের মূল সংস্কৃতি বা জীবনশৈলীর সঙ্গে একাত্মীভূত যে 'ভারতীয় সংবিধান' চেয়েছিলেন বাস্তবে তা হয়নি।

ন্যক্কারজনক ঘটনা : বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে স্টল প্রদানে বাধা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বইমেলায় এবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে স্টল দিতে অস্বীকার করেছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলারর্স গিল্ড কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেওয়া এক ভয়ংকর চক্রান্তের ইঙ্গিত। এরাজ্য যে ক্রমশ ইসলামি শাসনের দিকে এগোচ্ছে তার স্পষ্ট প্রমাণ এই চক্রান্ত। বিশ্ব হিন্দু বার্তার তরফে কলকাতা উচ্চ আদালতে এর প্রতিকার চেয়ে মামলা করা হয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ শুনানির সময়ে বিচারপতি শ্রীমতী অমৃতা সিনহা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গিল্ডের আইনজীবীকে কড়া ভাষায় ধমক দিয়ে বলেছেন, আপনারা এত বছর তাঁদের বই মেলায় স্টল করার অনুমতি দিয়েছেন আজ কেন তা দিচ্ছেন না। পরের শুনানির দিন গিল্ডকে জানাতে বলা হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে স্টল দেওয়ার ব্যাপারে তারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোথায় কতটা জায়গা দেওয়া হয়েছে।

গিল্ডকে বিচারপতি সিনহার মৌখিক নির্দেশ, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলের জায়গা ঠিক করে আদালতে পরের দিন জানান।' বিশ্ব বিন্দু পরিষদের পক্ষে আইনজীবী সুবীর সান্যাল বলেন, 'সমস্ত শর্ত মেনে বইমেলায় স্টল দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। সেই শুনানিতে তিনি দাবি করেন, 'গিল্ডের তরফ থেকে বিভিন্ন শর্ত দিয়ে স্টলের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে ৬০০ স্কোয়ার ফুটের জায়গার কথা বলে সব শর্ত মেনে আবেদন জানানো হয়েছিল। স্টল না পাওয়ার কারণ জানতে চেয়ে আমরা ১০ জানুয়ারি ইমেল করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি। পরিষ্কার করে কিছু বলা হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।'

একটু পিছনে যাওয়া যাক। এর পিছনে শুধু শাসক দল নয়, বামপন্থীরাও আছে। ২০২০ সালে স্টল দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলে কয়েক লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এখানে পবিবেশিত বইয়ের মধ্যে একটাও অসত্যভাষণ ছিল না তবুও প্রতিবারের মতো অতিবামপন্থী, ভিন্ন মাত্রিক ভাষ্যে ইসলামিক সংগঠনগুলি অকারণে এই স্টলে হামলা চালিয়েছিল।

মূলত হিন্দু ধর্মের উপর লিখিত অত্যন্ত উঁচুমানের নানারকম বই এখানে বিক্রির জন্য রাখা হয়। স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বামাচারী বা অন্যান্য হিন্দুবিরোধী দল যেমন কংগ্রেস বা সমমনস্ক অন্য দলের অপপ্রচারের দরুন হিন্দু শব্দটিই ঘৃণ্যতার দ্যোতক হয়ে গেছে। এখন তাতে উচ্চস্বরে কণ্ঠ মিলিয়েছে কিছু বাজারি পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম। প্রতিবার ইসলামিক বুক সেন্টার ও বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন থেকে ইসলামের উপর লিখিত অসংখ্য বই বিক্রি হয়, কোনো সমস্যা নেই। বইমেলার প্রবেশদ্বার থেকে সর্বত্র বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ করা হয়, কোনো সমস্যা নেই। বইমেলার প্রবেশদ্বার থেকে সর্বত্র বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ করা হয়। না, কোনো সমস্যা নেই। যত সমস্যা হিন্দুধর্ম বিষয়ক কোনো কিছু লেখা বা পুস্তিকা থাকলেই। অত্যন্ত বেদনা, বিষাদ ও আক্ষেপের ব্যাপার হলো এতে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই হিন্দু, তাদের মধ্যে আবার বেশ কিছু পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণী।

২০১৬ সালের তখন মিলনমেলায় বইমেলা হয়েছিল। তখন ইসলামিক বুক সেন্টারের সামনে মাওবাদীরা, সবাই হিন্দু, হাতে স্লোগান লেখা অসংখ্য প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাতে লেখা হিন্দুত্ব নিপাত যাক, খাগড়াগড়ের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত করা চলবে না এবং সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে নিঃশর্তভাবে। তারপর এরাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলের সামনে আসে। ওই গোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীরা হাততালি দিয়ে নেচে-গেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল আর হিন্দু ধর্মের মুণ্ডপাতকারী সব উক্তি করছিল। পুলিশে খবর দিলে তারা হাতে-পায়ে ধরে এইসব অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক-যুবতীদের এবং তাদের ইন্ধনজোগানো পরিণতবয়স্ক কিন্তু অপরিণতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের দলকে সরায়। আর একটু সুযোগ পেলেই এরা স্টলে শারীরিকভাবে আক্রমণ করত। কিন্তু কখনো এই দুই প্রতিষ্ঠান অন্য কারও সামনে বা অন্য কোনোভাবে বিক্ষোভ দেখায়নি বা কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তবু হামলা হয় বারেবারে।

সেবার ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ কিছু মাওবাদী ভিএইচপির স্টলের সামনে ধেয়ে আসে মারমুখী হয়ে। কিন্তু ভিএইচপির কর্মী ও কর্মকর্তারা শান্তভাবে তার মোকাবিলা করেন। মাওবাদীরা দেশবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে ও হুমকি দেখায়। পুলিশ কোনো ক্রমে সামাল দেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ বেশ কিছু উগ্রপন্থী বাম সংগঠন দল বেঁধে মারমুখী হয়ে প্রথমে জনবার্তার সামনে আসে। তাদের সঙ্গে চলছিল পুলিশের দল। পুলিশ তাদের সুরক্ষা দিচ্ছিল। বেশ কিছু সময় ধরে তারা জনবার্তার স্টল আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। স্টলের লোকজন হামলাকারীদের ঠেকাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনো উত্তেজনা দেখায়নি। প্রায় আধ ঘণ্টা হামলা চালিয়ে তারা যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলের সামনে এবং তাদের মধ্যে যতজন সম্ভব স্টলের ভিতরে ঢুকে বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে। এক যুবক, পরে তার নাম ঋক বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতার উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে থাকে। ভিএইপির মহিলা সমর্থকরা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে এবং পুরুষ কর্মীরা তাদের স্টলের বাইরে বার করে আনে বহু কষ্টে। কিন্তু মাওহাদীরা নাছোড়। ধস্তাধস্তি চলে। পুলিশ কিন্তু তাদের একবারও বারণ করে না। বোঝাই যায়, শাসকদলের সমর্থন না থাকলে তারা এই পর্যন্ত আসতেই পারত না। পুলিশ বিশ্বহিন্দু পরিষদকে বলে স্টল থেকে হনুমান চালিশা বিতরণ করা যাবে না। অদ্ভুত যুক্তি! হিন্দুদের দেশ ভারতে হিন্দু ধর্মপুস্তক বিলি করা যাবে না কিন্তু ইসলামিক জিহাদের বই ও বাইবেল বিলি বা বিক্রি করা যাবে। যেভাবে তারা আক্রমণ চালাচ্ছিল যে কোনো কিছু ঘটতে পারত। অথচ কোনো সংবাদপত্রে দেখা যায়নি না এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করতে। প্ররোচনামূলক স্লোগান দেওয়ারও একটা সীমা থাকে। এবার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শুরুর পটভূমিকা

অভিমন্যু রায়

শতবর্ষ আগে সময়ের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শুরু হয়েছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার তাঁর স্বল্প রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসে ছিলেন। দেশে তখন ইংরেজের প্রবল শোষণ ও শাসন। ইংরেজ শাসনের জাঁতাকলে তখন দেশবাসী নাকাল। দেশবাসীর মনে তখন একটাই স্বপ্ন— স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের তখন দুটি পৃথক ধারা। একদল নরম পন্থায় আর অন্যদল চরম পন্থায় ইংরেজ তাড়ানোয় বিশ্বাসী। স্বভাবতই শিক্ষিত, বয়োবৃদ্ধ, সংসারী আর প্রতিষ্ঠিতরা প্রথম দলে। আর যুবক তরুণ, শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় দলে।

এই প্রেক্ষাপটে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হলো। কেন হলো? ডাঃ হেডগেওয়ার কেন কংগ্রেসেই থেকে গেলেন না? কেন তিনি কংগ্রেসের লোভনীয় সুযোগ ছেড়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন? এই রহস্য বুঝতে হলে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে প্রথমে বুঝতে হবে।

কেশব ছিলেন বাল্যকাল থেকেই স্বাভিমানী। স্বদেশপ্রীতির মানসিকতা তাঁর রক্তে। যে বয়সে ছেলেরা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ডাংগুলি খেলে, সেই বয়সে কেশব নাগপুর শহরের সীতাবর্ডি দুর্গের ইউনিয়ন জ্যাক নামানোর ফন্দি আঁটেন সুড়ঙ্গ কেটে। মাত্র আট বছর বয়সে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভিষেকের ৬০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে স্কুলে বিতরিত মিষ্টি ছুঁড়ে ফেলে দেন। ১৯০২ সালে রাজা এডুয়ার্ড সেভেনের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে হওয়া আনন্দোৎসব বয়কট করেন। তখন তিনি মাত্র বারো।

কেশব বড়ো হয়েছেন সংবাদপত্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের জ্বালাময়ী লেখা পড়ে। তিলকের 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার' বাক্যটি জীবনের তাঁর বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কেশব শিবাজী মহারাজের প্রদর্শিত পথকেই তার ভবিষ্যতের কর্ম পথ হিসেবে নিশ্চিত করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকার বঙ্গ বিভাগ ঘোষণা করলে সমগ্র দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সেই প্রতিবাদে কেশবও শামিল হন। বন্দেমাতরম্ তখন জাতীয় মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পরস্পর অভিবাদনের শব্দও হয়ে উঠেছে এই বন্দেমাতরম্।

১৯০৮ সালে কেশবের নেতৃত্বে নাগপুরের নীল সিটি হাইস্কুলের ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অভিবাদন জানায় 'বন্দেমাতরম' বলে। যথারীতি স্কুলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যায়। শেষ পরিণতি স্বরূপ তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু কেশব দমবার পাত্র নন। অন্য একটি স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে কেশব কলকাতা এলেন ডাক্তারি পড়তে। কলকাতা তখন বিপ্লবের পীঠস্থান। বড়ো বড়ো বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র। পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে দেখা করে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর লেখা গ্রন্থ 'কারাগারে ত্রিশ বছর' পুস্তকে বার কয়েক সহ বিপ্লবী হিসেবে হেডগেওয়ারের উল্লেখ আছে।

ফঃ ৬

কলকাতায় কেশব ডাক্তারি পড়ার সময় অনুশীলন সমিতির আখড়ায় নিয়মিত যেতেন। ১৯১৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের হয়ে দামোদরের বন্যায় দুর্গতদের মধ্যে সেবাকাজ করেন। গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের মকর সংক্রান্তি স্নানে যাবার পথে চিকিৎসা সেবাপ্রদান করেন। গণেশ উৎসব চালু করেন। এসবের মধ্যে মানুষের মনে দেশভক্তি জাগরণই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

১৯১৫ সালে ডাক্তার হয়ে নাগপুর ফিরে গিয়েও ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত হলেন না। কিছুদিন বিপ্লবের কাজে মেতে রইলেন। শুরু করলেন 'নরেন্দ্রমণ্ডল'। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাউজী কাওরে এবং আন্না খোটকে সঙ্গী হিসেবে পেলেন। স্থাপন করলেন ব্যায়ামশালা। নাগপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ের পাশে সে ব্যায়ামশালাটি এখনো বর্তমান। ডাক্তার হেডগেওয়ার নাগপুরের মহল্লায় বিতর্ক সভার আয়োজন করেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে অর্থ সংগ্রহ করলেন। সেই অর্থে অস্ত্র কেনা হয়। অতি গোপনে সেই অস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে পৌঁছে যায়। বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যরা কলকাতা, হায়দরাবাদ, গোয়া প্রভৃতি স্থান থেকে অস্ত্র আনা আর সে অস্ত্র গোপনে বিপ্লবীদের ডেরায় পৌঁছে দেবার কাজ নিয়মিত করেছিল। এই অস্ত্র সংগ্রহের কাজ বিপ্লবীরা পুলিশের চোখ এড়িয়ে করতে পারত না। ওরা এই দায়িত্ব নেওয়ায় বিপ্লবীদের সুবিধাই হয়। ডাক্তার হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সংগঠনের সঙ্গী দাদাসাহেব বকশি বিপ্লবীদের জ্যাম হয়ে যাওয়া পিস্তল সারাইয়ের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। এটাও খুব কাজে লেগছিল। পঞ্জাব ও বঙ্গের বিপ্লবীদের খুব নিকট সঙ্গী ছিলেন ডাঃ হেডগেওয়ার। বিপ্লবী সর্দার ভগৎ সিংহের সহযোগী রাজগুরুকে কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছিলেন।

গোপনে বিপ্লবী কাজকর্মের পাশাপাশি ডাঃ হেডগেওয়ার কংগ্রেসের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনেও অংশ নিতে শুরু করেন। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের রাশ গান্ধীজীর হাতে। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। ডাঃ হেডগেওয়ার সত্যাগ্রহে অংশ নেন এবং গ্রেপ্তার হন। তখনকার দিনে আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলখাটা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বড়ো সম্মানের বিষয়। কারণ এর ফলে সমাজে তখন তার প্রভাব বেড়ে যেত। সংগঠনেও দাম বাড়তো। গ্রেপ্তার হলে সাধারণত কেউ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো বক্তব্য রাখত না। নির্বিবাদে এক দু' মাসের জন্য জেলে চলে যেত। কিন্তু ডাঃ হেডগেওয়ার অন্য ধাতুতে তৈরি ছিলেন। তাঁর কাছে দেশের কাজই মুখ্য, দেশের স্বার্থ সর্বোচ্চ। তিনি নিজের লাভের জন্য দেশের কাজই নামেননি। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের অছিলায় আদালতে ইংরেজ শাসনের এমন তুলোধোনা করলেন যে তাঁর এই বক্তব্য আসল বক্তব্যের চেয়েও গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। বিচারক তাঁকে এক বছরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ডাক্তারজী যখন জেলে তখন ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় জ্বালাময়ী নিবন্ধ লিখে দেশদ্রোহের অপরাধে গান্ধীজীরও ছয় বছরের জেল হলো। তাঁকে বার্মার মান্দালয় জেলে পাঠানো হলো। পুরো দেশ গান্ধীজীর সমর্থনে পথে নেমে এল।

১২ জুলাই ১৯২২ ডাঃ হেডগেওয়ার জেল থেকে মুক্তি পেলেন। সে উপলক্ষ্যে নাগপুরের বেঙ্কটেশ নাট্যগৃহে এক সভার আয়োজন করা হয়। সে সভায় মোতিলাল নেহরু, বিঠ্ঠল ভাই প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, ডাঃ আনসারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেবছর ডাঃ হেডগেওয়ারকে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

এদিকে ইতোমধ্যে ডাঃ হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডাঃ এনএস হার্ডিকর হিন্দুস্থানী সেবাদল নামে এক পরীক্ষামূলক সামাজিক সংস্থা শুরু করে দেন। প্রথম প্রথম কংগ্রেসের কিছু নেতা প্যারেড করা এই মিলিটারি টাইপ সংস্থাকে কংগ্রেসের নম্র আদর্শের বিপরীত বলে বর্ণনা করে এর বিরোধিতা করেন। পরে অবশ্য এই সংস্থাই কংগ্রেস সেবাদলে পরিণত হয়।

এর মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডে নামে এক সজ্জন রাষ্ট্রীয় মল্লবীর শালা নামে একটি কুস্তি শেখার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। ডাঃ হেডগেওয়ার এই কুস্তি শালার ট্রাস্টের সভাপতি হন। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে ডাঃ হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ ডাঃ পরাঞ্জপে 'ভারত স্বয়ংসেবক মণ্ডল' শুরু করেন।

এই সময় ডাক্তারজীর চিন্তাভাবনায় এক বড়ো পরিবর্তন আসে। তিনি অনুভব করতে শুরু করেন যে শুধুমাত্র গোপন বৈপ্লবিক কাজকর্মের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। গান্ধীজীর মুক্তির দাবিতে আয়োজিত জনসভায় তিনি বার বার বলে যেতে থাকেন, স্বরাজ অর্জনের জন্য প্রথমে শারীরিক শক্তি অর্জন করতে হবে, তারপর ব্রিটিশের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা আসবে।

তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রবণতা লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে গেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ ব্যক্তিপূজার আন্দোলনে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তারজী দেখলেন, বিশাল প্রভাব সম্পন্ন নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ স্বরাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তিলক জেলবন্দি হতেই সে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে ডাক্তারজী উপলব্ধি করলেন, দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সঠিকভাবে না পৌঁছানোর জন্যই এমন হচ্ছে। তিলক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের বক্তব্য বুঝে না বুঝে হাজার হাজার জনতা হাততালিতে সভা ভরিয়ে দিচ্ছে। পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছে। আন্দোলনে মার খাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের অনুপস্থিতিতে সব কিছুই ঠাণ্ডা।

এর মধ্যে শুরু হলো নতুন উৎপাত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইংরেজ ঘোষণা করল, দেশ সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনা বা চুক্তির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান উভয়পক্ষের নেতৃত্বের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

কংগ্রেস না বুঝেই ইংরেজের পাতা ফাঁদে পা দিল। কংগ্রেসের প্রতিটি সভায় স্বাধীনতার চেয়ে হিন্দু-মুসলমান একতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। যদিও মুসলমানদের একটা

অংশ মোল্লাবাদের পথে হেঁটে নিজেদের পৃথক সংগঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারত ভাঙার আলাপ আলোচনা করতে শুরু করে। মুসলমানদের মন পেতে এবং তাদের কংগ্রেসে ধরে রাখতে কংগ্রেস খিলাফত নামের চরম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে নিজেদের সমর্থন জানায়।

অথচ খিলাফত আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য রক্ষায়। সেখানকার পদচ্যুত খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে পদে ফেরানোর লক্ষ্যে, যার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো যোগই ছিল না। খিলাফত আন্দোলনে ব্রিটিশ বিরোধিতার নামে মুসলমানরা স্থানে স্থানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে। অথচ অটোমান সাম্রাজ্যের খলিফার পদচ্যুতিতে হিন্দুদের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

ডাক্তারজী বুঝতে পারছিলেন দেশের জনগণের ইচ্ছায় জননেতারা তাদের আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করছেন না। বরং তাদের নিজস্ব লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী জনতাকে পরিচালিত করছেন। ডাক্তারজী সিদ্ধান্তে এলেন আপামর জনতাকে কাঠেরপুতুল বানিয়ে রেখে কোনো দেশ বা জাতির পক্ষে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি অনুভব করলেন দেশের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন এবং শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।

তখনকার দিনে ইংরেজ শাসক সুকৌশলে প্রচার করে ভারত কোনো সুপ্রাচীন রাষ্ট্র নয়, ইংরেজ আসার পর ভারতের সৃষ্টি হয়েছে, একথাও বলা হচ্ছিল ভারত কোনোদিন এক দেশ ছিল না।

ডাক্তারজী এই ধারণার সঙ্গে কোনোভাবেই সহমত ছিলেন না। এই ধারণা মানতে হলে মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহের লড়াইয়ের কোনো তাৎপর্যই থাকে না। অথচ ভারত রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সেই সময় ডাক্তারজীর চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সমর্থ রামদাস বিরচিত 'দাসবোধ' এবং লোকমান্য তিলক রচিত 'গীতা রহস্য' নামক দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করে। রামদাসের মতো ডাক্তারজীও মনে করতেন সমাজ নির্মাণের জন্য কাজ যিনি করবেন, তার শরীর দৃঢ় এবং মন পবিত্র হতে হবে। আর এর জন্য নিত্য অনুশীলন প্রয়োজন।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের দুর্দশার জন্য এবং বারবার পরাধীনতার জন্য এই দেশের মূল যে সমাজ অর্থাৎ হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রবলভাবে দায়ী। হিন্দুরা জাতপাত, স্পৃশ্য- অস্পৃশ্যতা এবং নানাবিধ অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত। তাই হিন্দু সমাজের যথাযথ সংস্কার না হলে, তাদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেম জাগ্রত না হলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই দেশ পুনরায় পরাধীন হয়ে যাবে। তিনি তাঁর এই উপলব্ধির কথা ঘনিষ্ঠজনদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি জানালেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করে দেশের দীর্ঘস্থায়ী উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ রাজনীতির কাজের বেশিরভাগটাই চলে ক্ষণস্থায়ী লাভ-লোকসানের নিরিখে। ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবাত্মার উত্তরণের জন্য রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ জাগরণ এবং জাতি গঠনের কাজ করতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সমাজকে সশক্ত করতে গেলে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা হবে নীরবে, নিঃশব্দে। রাজনীতির হট্টমেলা থেকে দূরে থেকে ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ডাক্তারজী তার সকল রাজনৈতিক প্রাপ্তিকে হেলায় দূরে ঠেলে মাত্র কয়েকজন সমমনস্ককে নিয়ে এক সংগঠন স্থাপনা করলেন। সে দিনটি ছিল ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীর পুণ্যতিথিতে সমবেত গুটিকয় মানুষ ডাঃ হেগেওয়ারের সঙ্গে দেশের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার পণ করলেন।

তারপর ১৯২৬ সালের ১৩ এপ্রিল বৈঠক বসলো। সংগঠন শুরু তো হলো। এর নামকরণ করা দরকার। তিনটি নাম নিয়ে চুলচেরা বিচার হলো। তারপর নাম স্থির হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। দেশপ্রেমিক মানুষের স্বেচ্ছা সংযোজনে পরিচালিত এই সংগঠন এই বছর শতবর্ষে পদার্পণ করেছে।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫।৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রকাশ্য গণ কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১২ জানুয়ারি 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ, ২০১৬'-র উদ্যোগে কলকাতায় ধর্মতলা-স্থিত ওয়াই চ্যানেলে আয়োজিত হয় একটি 'প্রকাশ্য গণ কনভেনশন'। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রবুদ্ধ নাগরিক সমাজ এবং বিশিষ্ট জনেরা। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা এসএলএসটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্যানেলটিকে গত বছরের ২২ এপ্রিল বাতিল বলে ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়টিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্যানেলভুক্ত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. বুদ্ধদেব সাউ, প্রাক্তন অধ্যাপক, লেখক ও প্রাবন্ধিক ড. পুলকনারায়ণ ধর, স্কুল সার্ভিস কমিশন (সাউথ-ইস্ট রিজিয়ন)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দীপক মজুমদার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং শিল্প বিষয়ক পরামর্শদাতা ড. সুদীপ্ত গুহ, ড. কৃত্তিবাস দত্ত, সাবর্ণ মণ্ডল, মীরাতুন নাহার প্রমুখ। বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দুর্নীতির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন এবং যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে অযোগ্য-দুর্নীতিগ্রস্তদের একসারিতে এনে বিচার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তাঁরা বলেন যে, যোগ্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সিবিআই, প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ কমিটি, স্কুল সার্ভিস কমিশন, শিক্ষা দপ্তর প্রভৃতি সংস্থার কাছে কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ বা তথ্য নেই। কিন্তু রাজ্য সরকার ও শাসক দলের দুর্নীতির কারণে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে ৮.৫ শতাংশ ও ১৪.৪৭ শতাংশ প্রার্থী অবৈধভাবে নিযুক্ত। সিবিআই এই অবৈধভাবে নিয়োজিতদের তালিকা নাম-রোল নম্বর-সহ প্রকাশ করেছে। সেখানে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কারুর নাম নেই। এই কারণে দুর্নীতিগ্রস্তদের চাকরি খারিজ করা ন্যায়সঙ্গত হলেও গোটা প্যানেল বাতিল করা অযৌক্তিক। যোগ্য শিক্ষক- শিক্ষিকাদের তরফে তাঁদের দাবিগুলি তুলে ধরা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এসএসসি-সংক্রান্ত মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন। তাঁরা দাবি করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (স্কুল শিক্ষা দপ্তর, স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)-কে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করে রাজ্য সরকারের আইনজীবীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টকে উপযুক্ত ও নির্ভরশীল তথ্য দিয়ে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে আরও জোরালোভাবে সওয়াল করতে হবে। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরকে সেগ্রিগেশন লিস্ট (অর্থাৎ, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা তালিকা) সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা-সহ জমা করতে হবে। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় রাজ্য সরকারকে আরও মানবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

মহাকুম্ভে ১৫০০ জনের নাগা সন্ন্যাসে দীক্ষা গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের সপ্তম দিনে ১৯ জন মহিলা-সহ ১৫০০ জন গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস দীক্ষা। পঞ্চ দশনাম জুনা আখাড়ার তত্বাবধানে মহন্ত রামচন্দ্র গিরি, দুধ পুরী, নিরঞ্জন ভারতী ও মোহন গিরি সকলের মুণ্ডন সংস্কার করান। এরপর ১০৮ বার পবিত্র গঙ্গা জলে ডুব দিয়ে স্নান করে স্ব-পিণ্ডদান করে সকলে নিজেকে মৃত ঘোষণা করেন।

বর্তমানে জুনা আখাড়াতে ৫.৩ লক্ষের বেশি নাগা সন্ন্যাসী রয়েছেন। কুম্ভ বা মহাকুম্ভে নাগা সন্ন্যাস দীক্ষার কাজ মূলত নিরঞ্জনী, মহানির্বাণী, শৈব জুনা আখাড়া, আবাহন, অটল ও আনন্দ আখাড়াই করে থাকে। প্রতিটি কুম্ভেই বড়ো সংখ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়। নতুন সন্ন্যাসীরা রাতের বেলাতেই গঙ্গাতটে হবনাদি ক্রিয়া করেন। এই সন্ন্যাসীরা কুম্ভ সমাপ্ত হলেই কঠোর সাধনার জন্য গুরুর নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে চলে যান।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঝাড়গ্রাম জেলা কার্যবাহ সুমন সিনহার পিতৃদেব তুলসী সিনহা গত ১৭ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার বামনগোলা খণ্ডের পলাশবাড়ি শাখার স্বয়ংসেবক অধুনা মালদা নগর নিবাসী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালদা জেলার সহ সভাপতি রথীন্দ্রনাথ সরকারের পিতৃদেব রেণুকান্ত সরকার গত ১৮ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যবস্থাপ্রমুখ অরিন্দম সরকারের পিতৃদেব সুনীল কুমার সরকার গত ১৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor
Kolkata-700016
Phone : 22297263 (O) 40017926

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং চিন্ময় প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি সাংবাদিক সম্মেলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সনাতনী সংসদের পক্ষ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে গত ২ জানুয়ারি আয়োজিত হয় একটি সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে বিশ্বজুড়ে কাজ করে চলা 'গ্লোবাল হিন্দু কোয়ালিশন'-এর প্রতিনিধিরা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নিবাসী সীতাংশু গুহ, ব্রিটেন নিবাসী পুষ্পিতা গুপ্ত, লন্ডন নিবাসী সুশান্ত দাশগুপ্ত, সুইডেন নিবাসী চিত্রা পাল, কানাডার টরন্টো নিবাসী ইরা দত্ত ও অরুণ কুমার দত্ত, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নিবাসী অরুণ বড়ুয়া, আমেরিকার বোস্টন নিবাসী সুহাস বড়ুয়া, অধ্যাপক মোহিত রায়-সহ বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতৃত্ব। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সনাতনী সংসদের সভাপতি গোবিন্দ দাস। সম্মেলনটিকে পরিচালনা করেন সনাতনী সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রক্তিম দাশ। সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সেদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষেরা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হয়েই চলেছে। বাংলাদেশের কোনো সরকার কখনো সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ায়নি, কোনো অত্যাচারীর বিচার করেনি, সংখ্যালঘুদের কোনো দাবি মেনে নেয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় এই সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের তীব্রতা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা এই মুহূর্তে দিশেহারা। সীমান্ত বন্ধ, মোল্লাবাদীদের হিংস্রতা এবং প্রশাসন ও সরকারের জেহাদি দৃষ্টিভঙ্গি সংখ্যালঘুদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন প্রশাসন একটি কট্টর ইসলামপন্থী মোল্লাবাদী প্রশাসন, যারা জেহাদিদের পিঠ চাপড়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। এই সরকার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা পরিবর্তন এবং সংবিধানের ইসলামীকরণ করতে চায়। বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখোমুখি। হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে একটি ভুয়ো মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর জামিনের শুনানিতে কোনো উকিলকে উপস্থিত হতে দেওয়া হয়নি। বহু বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, লুঠ হয়েছে, বহু মন্দির আক্রমণ হয়েছে, দেবমূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে, বহু নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটানো হয়েছে। কয়েকশ' হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে শতাধিক। সেই মামলায় অসংখ্য নিরপরাধ হিন্দু বন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রায় এক হাজার হিন্দুকে চাকুরি থেকে জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করেছে জেহাদিরা। সরকারি চাকুরিতে হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মিডিয়া সরকারি অবরোধের শিকার হওয়ার কারণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাজারী লেনে পুলিশ-মিলিটারি-মোল্লাবাদীরা মিলে সিসি ক্যামেরা ভেঙে প্রতিটি হিন্দু বাড়ির ওপরে আক্রমণ চালায়। করিমগঞ্জের কিশোরগঞ্জে রবিদাস নামে এক হিন্দু যুবককে উন্মত্ত জেহাদি জনতা ও মিলিটারি মিলিয়ে গত ১৬ নভেম্বর পিটিয়ে মেরে ফেলে। গত ৪ সেপ্টেম্বর, খুলনায় হিন্দু যুবক উৎসব মণ্ডলকে থানার ভিতরে পুলিশ-মিলিটারির সামনে জেহাদিরা মারধর করতে থাকে। স্থানীয় মসজিদ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ইসলাম অবমাননাকারী হিন্দু যুবক নিহত হয়েছে, এরপর জেহাদি জনতা ফিরে যায়। গুরুতর জখম হলেও যুবকটি বেঁচে যায়। এরকম ঘটনা এখন বাংলাদেশে নিত্য-নৈমিত্তিক। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীতে সংঘটিত হিন্দুমেধ যজ্ঞ পর্ব থেকে শুরু এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি হিন্দু মানবেতর জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইসলামি মোল্লাবাদের উত্থান ঠেকাতে সমর্থ না হলে বাংলাদেশের হিন্দু-সহ কোনো ভারতীয়ও কিন্তু নিরাপদ নয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশি মিলিটারিকে জেহাদিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। দু'কোটি হিন্দুকে নির্মূল করে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা করেছে মহম্মদ ইউনুস প্রশাসন। বাংলাদেশের জেহাদি প্রশাসনের অধীনে হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের টিকে থাকা কেবল তাঁদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্ন নয়, এটি ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং মৌলিক মানবাধিকারের জন্য একটি বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

বাংলাদেশে বিদ্যমান শত্রুভাবাপন্ন ও প্রো-জেহাদিস্ট অবৈধ প্রশাসনের অধীনে বিপন্ন হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বনবাসী, জনজাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে গ্লোবাল হিন্দু কোয়ালিশনের প্রতিনিধিরা এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁদের নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পেশ করেন।

(১) হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনজাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন।

(২) সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা।

(৩) ১৯৪৭ সালের দেশভাগের অসমাপ্ত জনসংখ্যা ভূমি-সহ বিনিময় সম্পন্ন করে বাস্তুচ্যুত সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপদ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

(৪) ভারত উদারভাবে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা কোটার জন্য বাংলাদেশকে সমর্তন প্রদান করে আসছে। কিন্তু ঢাকার শত্রুভাবাপন্ন, জেহাদি প্রশাসনের প্রেক্ষাপটে ভারতে সরকারের প্রতি সংগঠনের অনুরোধ যে তারা তাদের কূটনৈতিক কৌশল পুনর্বিবেচনা করুক এবং তাদের অবদানকে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলুক।

(৫) জাতিসঙ্ঘের শান্তি মিশনের সশস্ত্র বাহিনী প্রদানের দেশগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের সেনারা জাতিসঙ্ঘের শূন্য-সহনশীলতা নীতির প্রতি অনুগত। সংগঠনের তরফে ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা জাতিসঙ্ঘ এবং এর সদস্য দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানাক বর্তমান অবৈধ ও জঙ্গিভাবাপন্ন বাংলাদেশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে টার্গেটেড নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে, কারণ তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জনজাতি জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

SANHIT POLYMER Pvt. Ltd.

11, POLLOCK STREET, 3RD. FLOOR, ROOM NO. 3B/1

KOLKATA- 700 001, PH. - 033-22350278/79, M.- 9732024706

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

PP - Icecream cup & Container

HDPE LLDPE Tarpaulim

Pond Liner

Pole (Concrete)

Green House

Geomembrane

LDPE Film/Sheet

'CORAL' Water Tank

Disposal Glass & Cup

HDPE Pipe

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433

E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215